ভস্মাবশেষ

'অগ্নিসংস্কার'এর দ্বিতীয় পর্ব "ভস্মাবশেষ" ছাপিয়ে বের করতে এত দেরি হয়ে গেল যে, সে জন্য কৈফিয়ৎ দিতেও লজ্জা বোধ হয়। তবে কৈফিয়ৎ আমার আছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কাগজের অভাব, ছাপাখানার গোলমাল প্রভৃতি কারণে ইচ্ছা থাকলেও এত দিন এ পর্ব বের করা সম্ভব হয় নি। সহৃদয় পাঠক এ কথা বুঝে বিলম্বের ত্রুটি মার্জনা করবেন আশা করি।

কলিকাতা
১৫ই জুন, ১৯৪৮

মণীন্দ্র রায়

"সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যে দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি' বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।"

—রবীন্দ্রনাথ

অগ্নিসংস্কার

ভস্মাবশেষ

১

কলকাতায় জরুরী 'তার' পেয়ে অরুণাংশু উদ্বিগ্ন হয়েছিল; কিন্তু এলাহাবাদ পৌঁছবার পর তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বাড়িতে দুর্ঘটনা কিছু ঘটে নি; এমন কি অসুখও হয় নি কারও। তবু সারা বাড়িটার চেহারাই যেন বদলে গিয়েছে। রমেনবাবুর গাম্ভীর্য গিয়েছে বেড়ে; প্রতুলবাবুর কেমন যেন আনমনা ভাব; মহামায়া দেবীর মুখে-চোখেও উদ্বেগের কালো ছায়া।

বিশেষ ক'রে অনামিকার মধ্যেই পরিবর্তন এসেছে সব চেয়ে বেশি। তাকে আগের সে অনামিকা ব'লে আর যেন চেনাই যায় না। অরুণাংশু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে যে, অনামিকা সর্বদাই তাকে যেন এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে, বাড়ির দশজনের বৈঠকে সে নিজে তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেও অনামিকার দিক থেকে সাড়া সে একেবারেই পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে আলাপ জমাবার উপক্রম করলেই অনামিকা কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে পড়ে।

বিহ্বল অরুণাংশু কিছুই বুঝতে পারলে না,—এমন কি, কেন যে কলকাতা থেকে 'তার' ক'রে তাকে ডেকে আনা হ'ল তাও নয়।

মহামায়া দেবীকে বার বার জিজ্ঞাসা ক'রেও একটির বেশি উত্তর সে পেলে না, কাজ আছে, বাবা, কাজ আছে, নইলে কি আর—

শেষে অরুণাংশু বিরক্ত হয়ে বললে, কাজ, না হাতী! কেন, বাড়িতে সবাই তো দেখছি বেশ ভালই আছে।

এর উত্তরে মহামায়া দেবীও বিরক্ত হয়েই বললেন, তুই বলছিস কি, অরুণ? বাড়িতে সবাই ম'রে না যাওয়া পর্যন্ত এখানে বুঝি তোমার কোনই কাজ থাকতে পারে না?

আবার লাল হয়ে উঠল অনামিকার মুখ। না, কিছু ভাবি নি আমি।—বলতে বলতে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। হাস্নাহেনার একটা ডাল হাত দিয়ে চেপে ধরলে সে; ফুলের বেশ বড় একটা গুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে তা থেকে একটি একটি ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে সে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

স্মিতমুখে তার দিকে চেয়ে একটু পরে অরুণাংশু বললে, তুমি জিজ্ঞেস না করলেও তার কথাটা তোমায় আমি না জানিয়ে পারছি নে। তোমার কৌতূহল তার সম্বন্ধে খুব বেশি ব'লেই কদিন থেকেই তোমাকে তার কথাটা জানাবার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

অরুণাংশু থামলে—বোধ করি ইচ্ছা ক'রেই। সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল অনামিকা, সে যেন সম্মোহিতের চোখ।

সেই চোখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে অরুণাংশু বললে, তুমি যা ভেবেছিলে তার কিছুই হয় নি, অনু। বরং সুভদ্রা দেবীর কাছে এবার আমি বিদায় নিয়েই চ'লে এসেছি; ব'লে এসেছি যে, জীবনের টানে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছি আমি।

তার মানে?—অনামিকা সম্মোহিতের মতই অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তরে অরুণাংশু বললে, তার মানে, তাকে আমি ব'লে এসেছি যে, একদিন যে তাকে ভালবেসেছিলাম, আজ সেই স্মৃতিটুকুই কেবল আমার আছে, ভালবাসা আর নেই।

অনামিকার পাথরের মত শরীরটাও হঠাৎ যেন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল; বড় বড় বিস্ফারিত চোখ দুটিকে আরও বড় ক'রে প্রায় আর্তনাদের স্বরেই সে বললে, এই তাঁর মুখের উপর তাঁকে ব'লে এসেছেন আপনি?

এমন অরুণাংশু আশা করে নি। অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে। চোখ দুটিকে নামিয়ে কতকটা কৈফিয়তের স্বরেই সে উত্তর দিলে, না ব'লে আর উপায় ছিল না, অনু। ব্যাপারটা সত্যি ঘোরালো হয়ে উঠছিল। আরও কিছুদিন আগের মত চললে হয়তো দুজনেই নাগপাশে জড়িয়ে পড়তাম। তাই সময় থাকতেই সেই সম্ভাবনার গোড়া কেটে দিয়ে এলাম।

তারপর চোখ তুলে মুখখানাকে আবার হাসবার মত ক'রে সে বললে,

কাজেই, বুঝেছ, অনু, তোমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হ'ল না, আর সুযোগও রইল না তোমার ঘটকালি করবার।

কিন্তু অনামিকা ও রসিকতায় যোগ দিলে না। একটু হাসলেও না সে। আরও কিছুক্ষণ অভিভূতের মত অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং তারপর একটি কথাও না ব'লে অরুণাংশুকে এড়িয়ে খুব জোরে পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

অপ্রতিভ অরুণাংশু আরও বেশি অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিসমৃদ্ধ জীবনে এমন আর কোনদিনই হয় নি।

গত দুই মাসের মধ্যে অনামিকার অনেক রূপ সে দেখেছে। কিন্তু আজ ওর যে রূপ তার চোখে পড়ল তা অদৃষ্টপূর্ব। পরিহাস নয়, বিদ্রূপ নয়, উপেক্ষাও নয়,—ও যেন পরিপূর্ণ ঘৃণারই জীবন্ত অভিব্যক্তি।

সুভদ্রার কথাটা অনামিকাকে সে বলেছিল বাহাদুরি করবার জন্য। ভেবেছিল যে, শুনে অনামিকা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যা হ'ল তা তার প্রত্যাশার বিপরীত।

সেদিন সুভদ্রাকে কথাটা শুনিয়ে দেবার পরেও তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু আজ অনামিকার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে যে আঘাত এল, তা গিয়ে লাগল ঠিক ওই দুটি জিনিসেরই গোড়ায়। হঠাৎ তার মনে হ'ল যে, অনামিকার চোখে আজ সে যেন বড় বেশি ছোট হয়ে গিয়েছে। ওরই প্রতিক্রিয়ায় নিজের কাছেও নিজেকে ছোট মনে হতে লাগল তার।

তার সঙ্কুচিত মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুতাপের ভাবও জেগে উঠল, নিজে থেকে কথাটা অনামিকাকে সে না বললেই পারত।

জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করলে যে, প্রতিপক্ষীয়ের কাছে তার হার হয়েছে; তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে যে আঘাত সে পেয়েছে, তা তার নিজের অনেক বিশ্বাস, ভাল-মন্দের অনেক ধারণাকে শিকড়সুদ্ধ নাড়া দিয়ে তার জীবনের অনেক লাভ-লোকসান, অনেক চাওয়া-পাওয়াকেই যেন একেবারে নিরর্থক ক'রে দিয়েছে।

সে রাত্রে খাওয়ার সময় অনামিকার সঙ্গে আবার তার দেখা হ'লেও সে তার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলে না।

অনামিকার বুকের মধ্যেও সে রাত্রে ক্রমাগতই যেন ঝড়ের মাতামাতি চলতে লাগল।

সুভদ্রার সম্বন্ধে যে কথাটা অরুণাংশু অত সহজভাবে তাকে শুনিয়ে দিলে, তা তার মোটেই ভাল লাগে নি। ভাল লাগবার কথাও নয়। হিন্দু ঘরের একপত্নীনিষ্ঠ বাপের মেয়ে সে। নারী-পুরুষের ভালবাসা বন্যার মত এসে দুদিন পরেই কর্পূরের মত উড়ে যাবে—এই তত্ত্বটিকেই মন দিয়ে সে স্বীকার করতে পারে না। আগে অরুণাংশুর মুখে বার বার এ কথাটা শুনলেও কোনদিনই ওকে সত্য ব'লে সে মেনে নেয়ও নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অরুণাংশুর সঙ্গে সহজ একটা সম্বন্ধ বজায় রাখতে এতদিন তার দিক থেকে কোন বাধা ওঠে নি। কিন্তু আজ তা-ই উঠল। কারণটা সহজ। এতদিন অরুণাংশু তার কাছে ছিল সুদূরের বিস্ময়; কিন্তু আজ তাকে তার ভাবতে হ'ল নিজেরই ভাবী স্বামী হিসাবে।

তা ছাড়া, অরুণাংশুর সঙ্গে তার বিয়ের কথা উঠবার পরেও তার নিজের মনে একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সুভদ্রা দেবীকে অরুণাংশু অত বেশি ভালবাসে ব'লেই তাকে বিয়ে করতে সে মোটে রাজীই হবে না। কিন্তু আজ সে অনুভব করলে যে, এর পর তাকে বিয়ে করতে রাজী হওয়া অরুণাংশুর পক্ষে আর অসম্ভব না-ও হতে পারে। সেইজন্যই মনটা তার আরও বিকল হয়ে গেল।

একটি মেয়েকে অমন আত্মহারা হয়ে ভালবাসবার পরেও যে পুরুষ নিতান্ত অকারণে সেই মেয়ের সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে পারে, তাকেই নিজে সে কেমন ক'রে নিজের স্বামী ব'লে বরণ করবে?

একদিন নিজেই সে অরুণাংশুকে শ্মশানচারী শিবের সঙ্গে তুলনা করেছিল; কিন্তু সে রাত্রে কেমন যেন তার মনে হতে লাগল যে, সেই অরুণাংশুই আসলে সত্য-শিব-সুন্দরের জীবন্ত অস্বীকৃতি।

প্রায় সারাটা রাতই থেকে থেকে তার চোখ দুটি জ্বালা ক'রে জলে ভ'রে উঠতে লাগল। কিন্তু চোখের ওই জল কার জন্য,—তার নিজের, সুভদ্রার না অরুণাংশুর জন্য, তা সে কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না।

পরদিন প্রতুলবাবুকে একান্তে পাওয়ামাত্রই অনামিকা তাঁর গা ঘেঁষে ব'সে

দিলে যেমন হয় কতকটা তেমনি ব্যাপার ঘ'টে গেল অরুণাংশুর চোখের সামনে। এতক্ষণ চোখে যেন তার দৃষ্টিই ছিল না ; 'অনু' কথাটা কানে যেতেই কেবল যে তার অন্ধ চোখে দৃষ্টিই ফিরে এল তা নয়, তার চোখের সামনে অন্ধকার জগৎটাও সেই সঙ্গে আলোয় আলোময় হয়ে গেল। সেই উজ্জ্বল আলোকে জীবন্ত অনামিকাকে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে,—দূরে নয়, বাইরেও নয়, একেবারে তার নিজের বুকের মধ্যে।

তার নিজের মনেরই সুদূরতম ও নিবিড়তম গহনে চেতন চিত্তের অগোচরে গত দুই মাস ধ'রে যৌবনের শিল্পীদেবতার যে বিচিত্র শিল্পকার্য চলেছে, তারই সম্পূর্ণ রূপটা এখন এক নিমেষেই তার চোখের সামনে ধরা প'ড়ে গেল। সে বুঝলে যে অনামিকা তার অগোচরেই তার মনটাকে সম্পূর্ণ জয় ক'রে নিয়েছে,—তার হৃদয়ের সিংহাসনে গিয়ে বসেছে রাজরাণীর মহিমময়ী মূর্তিতে। তার নিজের মনের গত দুই মাসের ইতিহাসের মধ্যে কোথাও আর কোন অস্পষ্টতা রইল না। হঠাৎ একদিন নিজের বুকের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রেও সুভদ্রাকে কেন যে সে খুঁজে পায় নি, তা আজ এক নিমেষেই বুঝতে পারলে সে। বুঝলে যে, সুভদ্রার ওই আকস্মিক অন্তর্ধানের ব্যাপারটা কার্যকারণ সম্বন্ধহীন প্রকৃতির উদ্ভট একটা খেয়াল মাত্র নয়,—এই অনামিকাই সুভদ্রাকে তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গাটা নিজে দখল ক'রে নিয়েছে। সে আরও বুঝলে যে, সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীর মতই নিজে সে গত দুই মাস কাল এই অনামিকার আকর্ষণেই এরই চারিদিকে অন্ধের মত ঘুরে বেড়িয়েছে,—আকাশের চাঁদের টানে সমুদ্রের মত এই অনামিকার টানেই তার নিজের বুকের মধ্যে অত সব দুর্বোধ্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গের মত ফুলে ফুলে উঠেছে, এই অনামিকাকে জয় করবার উদ্দেশ্যেই নিজে সে ময়ূরের মত পেখম তুলে ওর কাছে কাছে নেচে বেড়িয়েছে, নিজের কীর্তি ও অকীর্তির নানা কাহিনী তাকে শুনিয়ে একটি সসম্ভ্রম সস্মিত দৃষ্টি, একটু হাসি, সমর্থনের দুটি একটি কথার জন্য সতৃষ্ণ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

সেই অনামিকারই সঙ্গে তার বিয়ে! নিজের মুখের ছোট্ট একটি সম্মতির

বিষয়েই সেই অনামিকাকে সে একান্তভাবে চিরদিনের জন্য লাভ করতে পারবে।

কিন্তু নিশ্চিত প্রাপ্তির উল্লাসে তার হৃৎপিণ্ডটা সতেজে একবার লাফিয়ে উঠেই হঠাৎ যেন একেবারে অসাড় হয়ে গেল। পাওয়ার ব্যাপারটা এক তরফা কারবার নয়। অন্ততঃ অরুণাংশুর যা জীবনধর্ম তার মূলনীতি এক তরফা দাবির জোরে কোন নারীকেই আত্মসাৎ করবার অধিকার স্বীকার করে না, বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েও নয়। কাজেই অনামিকাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে নিজে সে সচেতন হয়ে উঠবার পরের মুহূর্তেই যে কথাটা তার মনে উঠল তা এই যে, এ সম্বন্ধে তার নিজের আকাঙ্ক্ষা যত প্রবলই হউক না কেন, ওই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য অনামিকার তরফ থেকে আহ্বানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থাকা চাই। অথচ নিজের অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন কিছুরই সন্ধান সে পেলে না, যাকে আশ্রয় ক'রে মন তার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ বোধ করতে পারে। বরং অনামিকার অতীত আচরণ স্মরণ ক'রে সন্দেহই তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল যে, অনামিকা তাকে নিয়ে আর যা-ই করুক না কেন, তাকে স্বীয় অন্তরের সশ্রদ্ধ ভালবাসা দিয়ে প্রিয়তম ব'লে কিছুতেই বরণ করবে না।

আগের সন্ধ্যায় তারই মুখ থেকে সুভদ্রার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ির কথা শুনে অনামিকা যে ভাবে তার সান্নিধ্য এড়িয়ে দূরে স'রে গিয়েছিল, বিশেষ ক'রে সেই কথা স্মরণ ক'রেই অরুণাংশু অনামিকার সম্মতি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠল।

তাই কিছুক্ষণ পর মহামায়া দেবী আবার যখন তার মুখের দিকে চেয়ে তারই সম্মতির জন্য তাকে অনুরোধ করতে আরম্ভ করলেন, তখন হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে অরুণাংশু বেশ জোরে মাথা নেড়ে বললে, না, মা, এ হতে পারে না; কিছুতেই না।

মহামায়া দেবী বিস্মিত হয়ে বললেন, কি হতে পারে না?

এই বিয়ে।

কেন?

অনুর এতে মত হবে না।—ব'লে অরুণাংশু মুখ ফিরিয়ে নিলে।

দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিলে যে, এ বিয়েতে অনামিকা মত দিয়ে থাকলেও নিজে সে কিছুতেই মত দেবে না।

যাকে সে বেশ একটু ভয়ও দেখিয়ে দিলে,—তার অমত সত্ত্বেও তাঁরা যদি এ ব্যাপারে আরও বেশি অগ্রসর হন, তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই অপদস্থ হতে হবে।

স্ত্রীর মুখ থেকে মোটামুটি কথাটা শুনবার পর রমেনবাবু সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, এ আমি আগেই জানতাম, বানরের গলায় মুক্তোর হার শোভা পায় না।

মহামায়া দেবীর মনটাও দ'মে গিয়েছিল; তবু আর একজনের সন্তানের সঙ্গে তুলনা ক'রে নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে স্বামীর মুখের অমন মর্মান্তিক মন্তব্যটাকে মুখ বুজে তিনি মেনেও নিতে পারলেন না। মুখ ভার ক'রে তিনি বললেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি কথা,—রুণুকে কোন দিনই তো ভাল চোখে দেখ নি তুমি।

উত্তরে রমেনবাবুও বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি যা খুশি বলতে পার। তবে আমি নিজে সব জেনেশুনেও অসুর মত মেয়েকে ওই বাঁদরটার হাতে সঁ'পে দেবার জন্য তার বাপের উপর চাপ দিতে পারব না।

তা হ'লে এ বিয়ে তুমি ভেঙে দিতে চাচ্ছ?

আমি ভেঙে দিতে চাচ্ছি নে, অরুণ নিজেই ভেঙে দিয়েছে।

না, দেয় নি। আর দিতে সে পারবেও না। আমি ঠিক জানি যে, এ বিয়ে প্রজাপতির নির্বন্ধ, এ বিয়ে হবেই।

হয় যদি, তাতে তোমার চেয়ে কম খুশি হব না আমি। তবে আপাতত এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হতে পারবে না। আর ওঁদের আমি এখানে ধ'রেও রাখতে পারব না। ওঁরা যাবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে।

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধ'রে মহামায়া দেবী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন; তার পর বললেন, বেশ, আমিও ওদের আটকে রাখতে চাই নে। কিন্তু আর একটা কথা তোমায় আমি বলব, রাখবে?

রমেনবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, কি?

অরুণাংশুর সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল, না।

ওঠেও নি সে। হাওড়া স্টেশন থেকে সে সোজা গিয়ে উঠেছিল তাদের পার্টির আপিসে।

তথাপি শেষ পর্যন্ত বালিগঞ্জে ওই 'অনু'দের বাড়িতেই তাকে আসতে হ'ল। কারণ গরজ তার নিজের।

কিন্তু সে ওখানে আসতেই বাড়িতে একটা হৈ হৈ প'ড়ে গেল। নীচের বসবার ঘরে প্রতুলবাবু তখন অনামিকার সঙ্গে গল্প করছিলেন। অরুণাংশুকে দেখেই অনামিকা সচকিত বিস্ময়ে একবার 'অরুণদা' ব'লেই কুণ্ঠিতভাবে উঠে দাঁড়াল; প্রতুলবাবু রীতিমত উত্তেজিত হয়ে প্রায় একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে তুললেন।

এ কি কাণ্ড! কখন এলে তুমি? ওঁরাও এসেছেন তো? কি আশ্চর্য! লাগেজ-টাগেজ—ওরে কালাচাঁদ—আঃ, বেয়ারাগুলো গেল কোথায় সব?—ও অনু, দেখ না বাইরে গিয়ে—

দেখছি।—ব'লে ধীরপদক্ষেপে অনামিকা বারান্দার দিকে চ'লে গেল।

এ দিকে অরুণাংশু অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, কাকাবাবু, আর কেউ আসে নি,—আমার সঙ্গেও কোন লাগেজ নেই। আমি কলকাতায় এসেছি হপ্তাখানেক আগে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ, কাকাবাবু। আজ এখানে বেড়াতে এলাম—মানে, এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম কি না! আমি উঠেছি আমাদের পার্টির আপিসে।

পার্টির আপিসে?—সে কি কথা? আমার বাড়ি থাকতে—

নিজের খুব জরুরি কাজ আছে কিনা, ওখানে থাকলেই কাজের সুবিধে। তাই—

কৈফিয়তের পর অভিবাদন-আশীর্বাদের পালা। তাতেও মিনিট পাঁচেক কাটল। তারপর এক সময়ে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে প্রতুলবাবু ব'লে উঠলেন, অনু—ও অনু,—কোথায় গেলে তুমি? অরুণকে একটু চা দিতে হয় যে—

ঠিক আগের মতই ধীর পদক্ষেপে অনামিকা ঘরে এসে প্রবেশ করলে;

শান্ত কণ্ঠে বললে, চা নয়, বাবা,—ওঁর তো চা খাওয়া বারণ। আমি বেলের শরবত আনছি।

একটু পরে নিজেই শরবত নিয়ে এল সে। ততক্ষণে অরুণাংশুর সঙ্গে প্রতুলবাবু রাজনৈতিক আলোচনা শুরু ক'রে দিয়েছেন। ঠিক আলোচনা বলা চলে না, বক্তৃতা। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রথমে অরুণাংশুকে দু-একটা প্রশ্ন ক'রে শেষে তিনি নিজেই বক্তা হয়ে উঠলেন। অরুণাংশু কখনও ছোটখাটো দু-একটি মন্তব্য, কখনও দু-একটি প্রতিপ্রশ্ন ক'রে, আর কখনও বা কেবল ঘাড় নেড়েই শুধু তাল রেখে চলল। অনামিকা কিছুই বললে না। একটু দূরে চুপ ক'রে কেবল সে কখনও প্রতুলবাবুরও কখনও অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তার এমনি একটা চাউনি এক সময়ে প্রতুলবাবুর চোখে প'ড়ে গেল। সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্সের শাসন সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে কি একটা কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে, অনামিকা একদৃষ্টে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। অবশ্য পিতার দৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই অনামিকা চোখ সরিয়ে নিলে; প্রতুলবাবুও নিজের কথাটা শেষ করলেন, যেন কিছুই হয় নি। তবু ওইটুকুতেই তাল কেটে গেল। প্রতুলবাবুর মনে কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে, অরুণাংশু ও অনামিকাকে নির্জনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে তিনি আবার একটা অবিবেচনার কাজ ক'রে ফেলেছেন।

তাই মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ আলোচনা বন্ধ ক'রে পকেট থেকে ঘড়ি বের ক'রে ওরই দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন, আমার হাতে বড্ড জরুরি একটা কাজ রয়েছে, অরুণ। সেটা আজ রাত্রেই শেষ না করলেই নয়।

অরুণাংশু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তার মুখে কোন উত্তর ফুটবার আগেই অনামিকা বললে, তুমি যাও না, বাবা, অরুণদা তো এখান থেকে খেয়ে যাবেন; কাজেই তোমার কাজ সারবার পরেও কথা বলবার অনেক সময় তুমি পাবে।

প্রতুলবাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে ব'লে উঠলেন, তা বই কি—ঠিকই তো! না

কিন্তু চেষ্টা ক'রেও অনামিকার মুখখানা সে ভাল দেখতে পেলে না। আহত বিবর্ণমুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর আবার মুখখানাকে হাসবার মত ক'রে সে বললে, আমি তো তাই চাচ্ছি; কিন্তু ফল হচ্ছে কোথায়?

আপনি বললেই হবে, অনামিকা আগের মতই মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলে, আপনার অমতে কিছুই তো হ'তে পারবে না।

কিন্তু হচ্ছে,—অরুণাংশু উত্তরে বললে,—আমার মতামতের জন্য কিছুই আটকাচ্ছে না। এঁরা এঁদের পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়েই চলেছেন, কারণ এঁরা আশা পেয়েছেন তোমার কাছ থেকে। কাজেই এদের গতি বোধ করবার জন্যে যা করবার তা তোমাকেই করতে হবে,—কথাটা বলতে হবে তোমাকেই।

আমার যা বলবার তা আমি বলেছি।

তা হ'লে সেটা এখন উল্টাতে হবে।

তা আমি পারব না।

কেন?

নিজের মুখের কথা নিজে আমি পাল্টাতে পারি নে।

কিন্তু সে তো তোমার মনের কথা নয়। তুমি কথা দিয়েছ এঁদের চাপে প'ড়ে।

তা হ'লেও সে আমারই মুখের কথা। তা অস্বীকার করবার সাধ্য আমার নেই।

অরুণাংশু থ হয়ে গেল। অনামিকাকে আগেও তার দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, কিন্তু আজ তাকে সে একেবারেই বুঝতে পারলে না। বলবার মত কোন কথাও ভেবে পেলে না সে। বলবার দরকারও হ'ল না। একটু পরেই অনামিকা উঠে দাঁড়িয়ে ঠিক তার চোখের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ দৃঢ় স্বরে বললে, দেখুন, আপনার বাপ-মায়ের সঙ্গে আপনি যেমন খুশি তেমনি ব্যবহার করতে পারেন; কিন্তু আমার বাপের মনে আমি ব্যথা দিতে পারব না। তবে এ কথাও আপনি ঠিক জানবেন যে, এ বিয়েতে আপনার মত যদি না থাকে, তবে আমাদের তরফ থেকে কোন রকমেই আপনাকে বিব্রত করা হবে না।

একেবারে একা ফেলে চ'লে যাওয়াটা ঠিক হয় নি তোমার। অন্তত আমায় তো ডেকে দিয়ে যেতে পারতে!

এরও উত্তরে অনামিকা অকুণ্ঠিত স্বরেই বললে, তুমি কাজ করছিলে কি না, তাই তোমায় ডাকি নি। তা এখন তোমার কাজ যদি হয়ে গিয়ে থাকে তো তোমরা দুজনে গল্প কর,—আমি ততক্ষণে হাতের কাজটা সেরে আসি।

তার পর সহাস্য মুখখানি অরুণাংশুর দিকে ফিরিয়ে সকৌতুক কণ্ঠে সে আবার বললে, ছানার ডালনাটা আমি নিজের হাতে রাঁধছি। কেমন হয়েছে, খেয়ে বলতে হবে আপনাকে।

অরুণাংশুর কণ্ঠে উত্তর ফুটল না,—অনামিকার কথার তো নয়ই, পরে প্রতুলবাবুর কথারও নয়। খাওয়ার সময় এবং খাওয়ার পরে কারও মুখের দিকে ভাল ক'রে সে তাকাতেও পারলে না। মনটা তার সেই যে ভেঙে পড়েছিল, তারপর কিছুতেই আর জোড়া লাগল না। যে কথা অনামিকাকে সে বলতে এসেছিল তার অনেক কথাই যেমন তার বলা হ'ল না, তেমনি যে কথা শুনবার আশা তার ছিল তাও শুনতে পেলে না সে। ওদের কাছে বিদায় নিয়ে যাবার সময় সে না নিয়ে যেতে পারলে অবিসংবাদিত বিজয়ের উন্মত্ত উল্লাস, না স্বীকৃত পরাজয়ের কঠিন সন্তোষ।

পথে রিক্‌শা গাড়িটার মধ্যে চুপ ক'রে ব'সে কেবলই তার মনে হতে লাগল যে, সে যেন একটা অদৃশ্য অথচ দুশ্ছেদ্য জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে,—তার নিজের বাপ-মা, প্রতুলবাবু, অনামিকা আর সকলের উপরে তার নিজের মনেরই একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগতই তার চারিদিকে ওই জাল বুনে চলেছে, সে জাল ছিড়ে নিজেকে মুক্ত করবার সাধ্য তার নেই।

২

বিয়ে সম্বন্ধে অরুণাংশু তার মন ঠিক ক'রতে না পারলেও যথাসময়ে রমেনবাবু ও মহামায়া দেবী প্রায় আধ ডজন ঝি-চাকর এবং পর্বতপ্রমাণ লটবহর সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। বাসা-বাড়িতে তাঁদের সংসার জ'মে উঠল; অরুণাংশুকেও শেষ পর্যন্ত সেখানেই আসতে হ'ল।

প্রতুলবাবু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন ; বললেন, ঠিক তা নয়, রমেনদা,—তবে মুশকিল কি হয়েছে, জান ? ওই অনুর মনটাই আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

অনু !—বলতে বলতে রমেনবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—অনুর মনটা বুঝতে পারছ না তুমি ? কিন্তু উনি—মানে, তোমার বউদি যে, বলছিলেন যে, অনু নাকি তাঁর কাছে সম্মতি জানিয়েছে,—তোমাকেও বলেছে ?

তাই তো বলেছিল,—বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলেছিল।

তবে ?

তবে—এখন আমার মনে হচ্ছে,—মানে, কিছু আমি বুঝতেই পারছি নে, রমেনদা।

রমেনবাবু আর কোনও কথা বললেন না, কিন্তু তাঁর মুখখানা অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে উঠল।

একটু চুপ ক'রে থেকে নিতান্ত অসহায়ের মতই প্রতুলবাবুই আবার বললেন, কি বিপদেই যে আমি পড়েছি, রমেনদা, রাতে ভাল ঘুম পর্যন্ত হয় না। ইদানীং মাঝে মাঝে আমার কি মনে হচ্ছে, জান। মনে হচ্ছে যে, বেশ ছিল আমাদের আমলে,—ছোট থাকতেই ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত, বাপ-মা'রাই সব ঠিক ক'রে দিতেন, কাঁচা বয়সের দুটি ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে জীবনের সাথী হিসাবে পেয়ে খুব সহজেই পরস্পরকে ভালও বাসত। কিন্তু একালে বাপমায়ের ভাবনার আর সীমা নেই। এই আমাদের অনু আর অরুণের কথাই ধর না কেন। ওদের দুজনেরই বয়স হয়েছে, দুজনেই লেখা-পড়া শিখেছে, দুজনেরই পরিণত হয়েছে ওই যাকে বলে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। ওদের অমতে ওদের বিয়ে দেওয়া যায় না ; অথচ কি যে ওদের সত্যিকারের মত তা-ও জানা সহজ নয়। তরুণ চিত্তের অপার রহস্য বাইরে থেকে আমরা কেমন ক'রে জানব ? আর জানলেও কতটুকু জানব আমরা ?

রমেনবাবু উত্তরে শুধু বললেন, হুঁ। সেটা সম্মতি, না অসম্মতি তা বোঝাই গেল না।

একটু পরে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, সেইজন্যই আমি বিপদে প'ড়ে গিয়েছি, রমেনদা। মা-মরা ওই একটিমাত্র মেয়ে, দায় তো আমার কম নয়। তাড়াতাড়ি কিছু করতে সাহস হচ্ছে না আমার।

ফিরে গেল কলেজে, বললে যে, আগে লেখাপড়া, পরে দেশের কাজ। খুশি হলাম; ভাবলাম, ওর সুমতি হয়েছে! কিন্তু হরি হরি! এম. এ. পরীক্ষার ছ মাস আগে ও হঠাৎ ধুয়া ধরলে, এ দেশে লেখাপড়া কিছুই হয় না, ও বিলাত যাবে। কত বোঝালাম, রাগ করলাম, কিন্তু ওর মন ফিরল না; পরীক্ষা না দিয়েই ও বিলাতে পালিয়ে গেল। ফিরে এল কম্যুনিস্ট হ'য়ে। তারপর কি ও করেছে, কোথায় কেমন ভাবে থেকেছে, এ যুদ্ধকে একবার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও একবার জনযুদ্ধ ব'লে কি রকম লাফালাফি করছে, সে তো কিছু কিছু তুমি নিজেই জান।

প্রতুলবাবুর মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল, অরুণাংশুর জন্য নয়, অনামিকার চিন্তায়। এ হেন চপলচিত্ত যুবকের হাতে অনামিকাকে সুদূর ভবিষ্যতে সমর্পণ করবার চিন্তাকেও আর যেন তিনি আমল দিতে পারলেন না। পথ চলতে চলতে কেমন যেন তাঁর মনে হতে লাগল যে, বেশ হয় অরুণাংশু যদি ওকালতি করতে অস্বীকার ক'রে বসে অথবা সে যদি আগের মত আর একবার ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। চিন্তাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতেই তিনি অবশ্য লজ্জায় শিউরে উঠলেন; কিন্তু চেষ্টা ক'রেও মনের ওই ইচ্ছাটাকে তিনি একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না।

প্রতুলবাবুর গোপন মনের অশুভ ইচ্ছা এবং রমেনবাবুর আশঙ্কাসত্ত্বেও অরুণাংশুর মধ্যে অতীতের কোন দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেল না। অরুণাংশু তার মা-বাপের সঙ্গে বাড়িতেই থেকে গেল এবং ওর চাইতেও বড় কথা, নির্দিষ্ট দিনে প্রতুলবাবুরই বড় একজন মক্কেলের ছোট একটি মামলার ব্রীফ নিয়ে যথারীতি হাইকোর্টে ওকালতি শুরু ক'রে দিলে।

প্রতুলবাবু নিজের গাড়িতেই অরুণাংশুকে কাছারিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, বৈকালে তাকে নিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন; গাড়ি থেকে নেমেই হাঁক দিলেন, অনু—ও মা অনু!

উপর থেকে সাড়া দিয়েই অনামিকা দ্রুতপদে নীচে নেমে আসছিল, কিন্তু অরুণাংশুকে দেখেই দোরের কাছেই থমকে দাঁড়াল সে।

অরুণাংশুর আজ নূতন বেশ; পরনে দামী সাহেবী স্যুট, পায়ের জুতা

অরুণাংশু হাসিমুখে উত্তর দিলে, আমারই গাড়ি। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কিনে-ছিলাম দিন কয়েক আগে। এ কদিন কারখানায় ছিল, আজ নিজে নিয়ে এলাম আমি। চমৎকার রঙ করেছে, না?

চমৎকার, প্রতুলবাবু খুশি হয়ে সায় দিয়ে বললেন। তারপর মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মনে হয়, অনু?

বেশ গাড়ি, অনামিকা ঘাড়টা একটু কাত ক'রে উত্তর দিলে। তার পরেই অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, নতুন গাড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

অরুণাংশুর চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; সে বললে, বিশেষ কোথাও নয়, এই লেকের ধারে একটু ঘুরে আসব। তাই ভাবলাম যে তোমাকে একবার,—মানে, চল না তুমিও, বেশি দূর তো নয়!

আমি!

কথাটা ব'লেই অনামিকা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই পিছনে স'রে গেল।

সেটা লক্ষ্য ক'রেই প্রতুলবাবু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, যাও না, মা, কদিন থেকে শরীরটাও তো তেমন ভাল নেই তোমার। খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ ঘুরে এলে উপকার হবে।

কিন্তু এরই উত্তরে অনামিকা হঠাৎ যেন আগুনের মতই জ্ব'লে উঠে বললে, বাবা, তুমি জান, আজ মীরাদের বাড়িতে আমার যাবার কথা আছে।

অনামিকার পক্ষে এ রকম অসংযত আচরণ এতই অস্বাভাবিক যে, প্রতুল-বাবুর মাথাটা হঠাৎ যেন একেবারে গুলিয়ে গেল। থতমত খেয়ে অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, তাই নাকি? কিন্তু কই, আমি তো—

তুমি জান,—অনামিকা এবার গাঢ় স্বরে বললে,—তবু শুধু শুধু আমাকে কেবল বিব্রত করবার জন্যেই— বলতে বলতে কথাটা শেষ না ক'রেই হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে ভিতরে চ'লে গেল।

প্রতুলবাবু আর অরুণাংশু দুজনের মুখই একেবারে কালো হয়ে গেল; তার উপর নিদারুণ লজ্জায় প্রতুলবাবু অরুণাংশুর মুখের দিকে আর তাকাতেই পারলেন না।

বার দুই ঢোক গিলে অরুণাংশুই কোনরকমে বললে, আমি এখন আসি, কাকাবাবু। ব'লেই সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠল।

তাতেই প্রতুলবাবু তখনকার মত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু মনটা তাঁর আবার বিকল হয়ে গেল। আগের দিনও রমেনবাবুর সামনেই মহামায়া দেবী তাঁকে আশীর্বাদের দিন ঠিক করবার জন্য তাড়া দিয়েছিলেন, রমেনবাবু তার কোন প্রতিবাদ করেন নি। তাঁর নিজের মনটাও ধীরে ধীরে আবার যেন অরুণাংশুর দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। বুঝতেও তিনি পারছিলেন যে, অরুণাংশু অনামিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওই অনামিকাকে নিয়েই তিনি মুশকিলে প'ড়ে গেলেন। পর পর তিন দিন তাঁর চোখের সামনেই অনামিকা অরুণাংশুর সঙ্গে যে ব্যবহার করলে অনামিকার চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্যের সঙ্গে ওর সঙ্গতি একেবারেই নেই। কি যে ওর অর্থ, তা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। দিন তিনেক তিনি উন্মনা হ'য়ে কাটালেন। অবশেষে মানসিক অস্বস্তি আর সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞাই ক'রে বসলেন যে, লজ্জা-সঙ্কোচ সব বিসর্জন দিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা সম্বন্ধে আর একবার অনামিকার সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই তিনি আলাপ করবেন; তারপর হয় আশীর্বাদের দিন ঠিক ক'রে, নয়তো বিয়ের প্রস্তাবটাকে একেবারে ভেঙে দিয়ে বর্তমানের অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার অবসান ক'রে দেবেন।

আলাপের ধারাটাকে, এমন কি, ভাষা পর্যন্ত আগে থেকেই ঠিক ক'রে নিয়ে সেই রাত্রেই তিনি শোবার আগে অনামিকাকে নিজের কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার একটা কথার ঠিক উত্তর দেবে, মা?

অনামিকা বিস্মিত হয়ে বললে, কি কথা, বাবা?

সত্যি বল তো, মা,—অরুণকে তোমার কেমন মনে হয়?

কথাটা প্রথমে যেন অনামিকা বুঝতেই পারলে না; কিন্তু তার পরেই তার মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে সে বললে, আমার আবার কি মনে হবে?

কিন্তু প্রতুলবাবু মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, না, অনু, লজ্জা ক'রো না, মা? নিজে আমি বড্ড ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছি।

অনামিকা চমকে মুখ তুলে বললে, কেন, বাবা?

মন ঠিক করতে পারছি নে, মা।—প্রতুলবাবু উত্তর দিলেন, অরুণের হাতে তোমায় সঁপে দেবার কথা ভাবলেই মনটা আমার কেমন যেন বেঁকে যাচ্ছে।

অনামিকা এবার আর কথা বললে না, কিন্তু তার চোখ দুটি প্রতুলবাবুর মুখের উপরেই প'ড়ে রইল।

একটু পরে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, অরুণ যেন কেমন,—আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওর জীবনযাত্রার সাদৃশ্য একেবারেই নেই। তুমি নিজেই তো শুনেছ, দিনরাতই ওর মুখে লেগে রয়েছে হয় জনযুদ্ধ, নয়তো কিষাণ-মজদুরের কথা। দিন কাটে ওর হৈ হৈ ক'রে—হয় পার্কে, নয় কারখানার কুলিবস্তিতে।

কিন্তু এ কথা শুনে অনামিকা হেসে ফেললে; বললে, তা কেন বলছ, বাবা? সে সব তো দূর হয়ে গিয়েছে। আজকাল তো বাড়ি আর কোর্ট, কোর্ট আর বাড়ি,—এই নিয়েই ওর দিন কাটছে দেখতে পাচ্ছি।

প্রতুলবাবু চমকে উঠলেন; অনামিকার কথা বা হাসি কোনটাই যেন তিনি বুঝতে পারলেন না। স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একটু অতিরিক্ত উত্তেজনার সঙ্গেই তিনি বললেন, কিন্তু সেও তো ভাল নয়, মা; এও তো আর একটা সীমান্ত। কদিন এ ভাব থাকবে কে জানে!

অনামিকা এবার আর কথা বললে না, মুখ নামিয়ে নিজের আঁচলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, ওর অতীত ইতিহাসটাও শুনলাম খুব ভাল নয়; কোন কাজেই খুব বেশিদিন ও নাকি টিঁকে থাকে নি। তাই মনটা আমার কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে, একা একবার মনে হচ্ছে যে, এ বিয়ে যেন না হওয়াই ভাল।

অনামিকা মুখ তুললে না, কিন্তু মৃদু স্বরে বললে, বেশ তো, তাই যদি তোমার মত হয়!

প্রতুলবাবু আবার চমকে উঠলেন। এবারও কথাটা তিনি যেন ভাল বুঝতে পারলেন না; চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রেও অনামিকার মুখও ভাল দেখতে পেলেন না তিনি। বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর

খুলেই দেখ না।—ব'লে অরুণাংশু বাক্সটি অনামিকার দিকে আরও একটু ঠেলে দিলে।

শেষ পর্যন্ত বাক্সটি অনামিকাই খুললে। ভিতর থেকে বের হ'ল হীরার কাজ করা সোনার একটি ব্রূচ্। চোখ দুটি তার হয়তো বা ঝলসেই গেল; চমকে অরুণাংশুর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে।

অরুণাংশু হাসিমুখে বললে, তোমার জন্যে এনেছি।

আমার জন্যে?

হ্যাঁ। ব্যারিস্টারি ক'রে টাকা রোজগার করব, এ কথা কোনদিন ভাবি নি। কিন্তু সত্যি যখন মকেলের টাকা পকেটে এসে গেল, তখন সেটা কিসে খরচ করব, তা নিয়ে বড্ড ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছিলাম। শেষে হ্যামিল্টনের দোকান থেকে তোমার জন্য এই জিনিসটি কিনে টাকাটার সদ্গতি করলাম।

অনামিকা কোনও উত্তর দিলে না, এমনভাবে সে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল যেন অরুণাংশু তখনও কথা বলছে।

একটু পরে অরুণাংশুই কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, জিনিসটা কেমন? পছন্দ হয়েছে তোমার?

এইবার অনামিকার ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে ফুটে উঠল। চোখ নামিয়ে ব্রূচটির দিকে তাকাল সে; মুখে বললে, চমৎকার জিনিস, আপনার পছন্দের তারিফ না ক'রে পারছি নে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সটি বন্ধ ক'রে অরুণাংশুর দিকে ঠেলে দিয়ে সে আবার বললে, এ আপনি নিয়ে যান, ধন্যবাদ।

চক্ষের নিমেষে অরুণাংশুর মুখের হাসি নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল; আহতের মতই সে বললে, কিন্তু এ যে আমি তোমার জন্য এনেছি।

আমার দরকার নেই।—চট ক'রে উত্তব দিলে অনামিকা।

বেশ একটু চেষ্টায় মুখখানা হাসবার মত ক'রে অরুণাংশু বললে, তোমার দরকারের জন্য তো এটা আমি আনি নি। দেবার দরকার আমার। সেই জন্যই এটা তোমায় নিতে বলছি।

অনামিকা মৃদু কিন্তু কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলে, না, এ আমি নিতে পারব না,—নেব না।

নেবে না?—অরুণাংশু রুদ্ধকণ্ঠে বললে, আমার একটা উপহার তুমি নিতে পারবে না?

অনামিকা হঠাৎ যেন আগুনের মতই জ্ব'লে উঠল; দৃপ্তভঙ্গিতে মুখ তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, কেন বার বার আপনি আমায় অপমান করছেন?

অরুণাংশুর মুখখানা এবার ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল; ঢোক গিলে অস্ফুট স্বরে সে শুধু বললে, অপমান করছি!

অপমান নয় তো কি? অনামিকা আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে, নিজের গাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেন সিনেমায়; তারপর মোটরগাড়ি নিয়ে এলেন আমার বোনকে নিয়ে যাবার জন্যে; আজ বাক্সবাড়ি থেকে হীরার ব্রুচ নিয়ে এসেছেন আমায় উপহার দিতে। কেন, আমায় কি ভেবেছেন আপনি?

জলে ডোবা মানুষের মত হাঁপাতে হাঁপাতে অরুণাংশু বললে, এ কি বলছ, অনু? আমি তো—

থাক্, অনামিকা তাকে যেন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে, কৈফিয়ৎ আর আপনাকে দিতে হবে না।

একটু থেমে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সে আবার বললে, আমি আপনাকে বোঝাতেও পারব না। কেবল দয়া ক'রে আপনার ব্রুচ আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

ব'লেই চৌকি ছেড়ে উঠে সোজা সে জানালার ধারে চ'লে গেল।

অরুণাংশুর বিকল ইন্দ্রিয়গুলি আবার যখন কতকটা সতেজ হয়ে উঠল, তখন অনামিকার মাথার চুল আর পিঠের কাপড় ছাড়া কিছুই আর তার চোখে পড়ল না। তথাপি সেই দিকেই আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবার পর সে নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল; ব্রুচের বাক্সটির সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুখানা হাতই পায়জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে শান্ত গম্ভীর স্বরে সে বললে, আমি তোমায় অপমান করি নি, অনু, তুমিই বরং বার বার আমায় অপমান করেছ। কিন্তু থাক্ সে কথা। ব্রুচ আমি নিয়ে যাচ্ছি; আর সেই সঙ্গে নিজেকেও আমি তোমার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

অনামিকা নড়ল না, অরুণাংশুর দিকে ফিরেও তাকাল না সে। কিন্তু

এমনিতেই যে ছেলে উড়োপাখি, তাকে তুমি ওই কথা বলতে পারলে? অভিমানে আজ রাত্রেই ও যদি বাড়ি ছেড়ে যায়!

উপরে রমেনবাবু প্রায় চীৎকার করে বললেন, চ'লে যাবে? চ'লে গেলে আমি তো নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারি। শুধু চ'লে যাওয়া কেন, ও যদি ম'রে যায়, ওর মুখ যদি আর আমায় দেখতে না হয়, তবে, সত্যি বলছি তোমায়, নিজে আমি কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে আসব।

থাম তুমি।—মহামায়া দেবী স্বামীর উপরেও আরও এক পরদা গলা চড়িয়ে বললেন, তোমার ঘটে কতটুকু যে বুদ্ধি আছে, তা আমি জানি। এই ব্যাপারে আর একটি কথাও যদি তুমি বল তবে, আমিও সত্যি বলছি তোমায়, নিজে আমি তোমার সামনেই গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

পরদিন সকালেই প্রতুলবাবুকে ডাকিয়ে এনে মহামায়া দেবী রাত্তের ঘটনাটা তাকে খুলে বললেন।

প্রতুলবাবু প্রথমে শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ, এরই হাতে তিনি তার একমাত্র কন্যাকে সম্প্রদান করতে যাচ্ছিলেন! কিন্তু তার পরেই যেন ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বুকটা তাঁর কানায় কানায় ভ'রে উঠল, যাক, বিয়ে তো এখনও হয় নি, ভগবান নিজেই সময় থাকতে অরুণাংশুর মাথায় এই ভাবটা ঢুকিয়ে দিয়ে অনামিকাকে চরমতম দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু কোন ভাবনাই দানা বাঁধবার অবসর পেল না। বর্ণনাটা শেষ ক'রেই মহামায়া দেবী তাঁর একখানা হাত চেপে ধ'রে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললেন, ওকে ফেরাও, ঠাকুরপো। তোমারই বুদ্ধি আর তোমারই চেষ্টায় এতদিন ওকে ঘরে রাখতে পেরেছি। আজও তোমাকেই এ ভার নিতে হবে। ও তো তোমারও সন্তানের মতই।

প্রতুলবাবু বিহ্বল স্বরে বললেন, আমি! আমি কি করব, বউদি? আমার কথা কি ও মানবে?

মানবে. ঠাকুরপো।—মহামায়া দেবী কম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, আমি জানি, সব কলকাঠি তোমার হাতে আছে। একা তুমিই ওকে ফিরাতে পারবে।

প্রতুলবাবুর মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছিল; তবু ওরই মধ্যে তাঁর

অনামিকা এবার আর কোন কথা বললে না। একটু পরে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, বউদির বিশ্বাস যে, তুমি অরুণকে একবার নিষেধ করলেই সব গোলমাল চুকে যাবে।

আমি!—অনামিকা চমকে উঠে বললে।

প্রতুলবাবু বিব্রতের মত বললেন, হ্যাঁ, মা, বউদির বিশ্বাস যে, তোমার কথা অরুণ ঠেলতে পারবে না।

অনামিকা উত্তর দিলে না, কিন্তু তার গম্ভীর মুখ আরও যেন গম্ভীর হয়ে উঠল।

সেই মুখের দিকে চেয়ে প্রতুলবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, কি বল, মা, বলবে একবার অরুণকে?

অনামিকা মুখ নামিয়ে উত্তর দিলে, না, বাবা, আমি পারব না।

বিব্রত মুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর প্রতুলবাবু আবার অসহায়ের মত বললেন মা, অনু, বউদির যখন অমন বিশ্বাস তখন তুমি একবার—শুধু একটিবার—

কিন্তু কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না, অনামিকা দৃপ্তভঙ্গিতে মুখ তুলে বললে, বাবা!

প্রতুলবাবু থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেলেন।

কিন্তু অনামিকা থামলে না; ডান হাতে কপালের উপর থেকে রুক্ষ চুল কয়গাছাকে সরিয়ে দিয়ে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার বললে, তোমরা আমায় কি পেয়েছ, বাবা? আর কি করাতে চাও আমায় দিয়ে? পুরাণের দেবতারা তাদের অপ্সরীদের যে রকমে ব্যবহার করেছে, আজও শিকারীরা বুনো হাতী ধরবার জন্য পোষা মাদী হাতীকে যে রকমে ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি ক'রেই আমায় তোমরা বার বার ব্যবহার করছ। ওঁরা না হয় আমার কেউ নয়। কিন্তু তুমি? তুমি আমার বাপ হয়েও আমাকে দিয়ে— বলতে বলতে কথাটা সে শেষ না ক'রেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

প্রতুলবাবু হতবুদ্ধির মত বললেন, এ কি বলছিস মা?

পরের মুহূর্তেই চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে মাথা নেড়ে তিনি আবার বললেন, ভুল বুঝেছিস, অনু, একেবারে ভুল। তুই যে আমার

ভাই,—ওকে ফেরাতে না পারলে ওর বাপমায়ের কাছে আমি মুখই দেখাতে পারব না।

মজুমদার প্রতুলবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব,—আচ্ছা, আজই বলব।

তথাপি প্রতুলবাবুর সব সংশয় দূর হ'ল না, দোরের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, কিন্তু ভাই, তোমার কথাও অরুণ যদি না মানে?

তা হ'লেও ভাবনা নেই তোমার।—মজুমদার দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন।

তার পর অল্প একটু হেসে কথাটাকে তিনি বুঝিয়েও বললেন, যুদ্ধে ওর যাওয়া হবে না। হাজার হ'লেও সে হ'ল গিয়ে বিপ্লববাদী একটা রাজনৈতিক দলের লোক,—পুলিসের খাতায় লাল কালিতে তার নাম লেখা রয়েছে। এ রকম লোক দিয়ে সুযোগ সুবিধে মত দু-একটা কাজ করিয়ে নেওয়ার কথা আলাদা। কিন্তু এদের সৈন্যদলে ভর্তি করা? সে একেবারে অসম্ভব। বৃটিশ গভর্মেণ্ট অত বোকা নয় হে, প্রতুল,—অত বোকা নয়।

প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করলেন অক্ষরে অক্ষরে। সেই দিনই কম্‌রেড চ্যাটার্জির মারফতে অরুণাংশুকে তিনি ডেকে পাঠালেন নিজের আপিসে। সে এলে পরম সমাদরে তাকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নাকি এয়ার ফোর্সে যেতে চাচ্ছেন, অরুণাংশুবাবু?

বিস্মিত হয়ে অরুণাংশু বললে, তাই ভেবেছি বটে। কিন্তু আপনি কার কাছে শুনলেন? প্রবীরদা বলেছেন বুঝি?

সহাস্য কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে মিঃ মজুমদার উত্তর দিলেন, আশুন কি চাপা থাকতে পারে, অরুণাংশুবাবু? আমি সব খবর পেয়েছি। কার কাছে পেয়েছি, তা আপনি নাই বা শুনলেন। যে জন্য কষ্ট দিয়ে এত দূর আপনাকে টেনে এনেছি তাই আগে শুনুন। যুদ্ধ করতে আপনাকে যেতে হবে না,—সে জন্যে অন্য লোক আছে। আপনাকে আমরা চাই পলিটিক্যাল ফ্রণ্টে। সেখানে আপনি অপরিহার্য।

অরুণাংশু বিব্রতভাবে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে মিঃ মজুমদার গম্ভীর স্বরে আবার বললেন, না, মিঃ সেন, আপনাকে আমরা ছাড়তে পারি নে,—কিছুতেই নয়। দেখছেন তো দেশের

প্রতুলবাবুর কাছ থেকে ছুটে নিজের ঘরে পালিয়ে গিয়ে অনামিকা দোর বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। চোখের জল তখন আর তার বাধ মানে নি। কিন্তু উচ্ছ্বাস যখন কেটে গেল, তখন সে হয়ে উঠল অসাধারণ রকমের গম্ভীর। প্রতুলবাবু ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও বললে না সে; খাওয়ার পর তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়েই নিজে সে আবার শোবার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করলে।

বৈকালের দিকে আবার যখন সে ঘর থেকে বের হয়ে এল, তখন তার হাতে একখানা খামে আঁটা চিঠি। ঝির হাতে সেখানা দিয়ে সে বললে, ও-বাড়ির দাদাবাবুকে দিয়ে আসতে হবে। খবরদার, আর কারও হাতে যেন না পড়ে। পারবি?

যুবতী ঝির চোখ দুটি চিকচিক ক'রে জ্ব'লে উঠল। হাসি গোপন করবার জন্য মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে উত্তর দিলে, ওমা, এ আর পারব না কেন দিদিমণি! আমরা কি আর—

চুপ কর্—অনামিকা লাল হয়ে উঠে বাধা দিয়ে বললে, যা, পালা শিগগির। কিন্তু মনে থাকে যেন, আর কারও হাতে যেন না পড়ে।—ব'লেই সে ত্রস্ত পদে স্নানের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

সেই চিঠি প'ড়ে অরুণাংশু সারা রাত ঘুমোতে পারলে না; পরদিন সকালটা তার কাটল ছটফট ক'রে। বেলা বারোটা বাজতে না বাজতেই সে পায়ে হেঁটে প্রতুলবাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বাড়িতে কেউ নেই। প্রতুলবাবু কাছারিতে গিয়েছেন, ঝি-চাকরেরা তাদের মহলে গিয়েছে বিশ্রাম করতে। কেবল অনামিকার খাস ঝিটি বাইরের ঘরে বোধ করি বা অরুণাংশুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। তাকে উপরে অনামিকার ঘরে পৌঁছে দিয়েই সেও উধাও হয়ে গেল।

তবু এই খালি বাড়িতেও অনামিকা নিজের হাতে ঘরের দোর বন্ধ ক'রে হুড়কো এঁটে দিলে। কিন্তু তার পরেই অরুণাংশুর ঠিক সামনের আসনটিতে ব'সে সোজাসুজি তার মুখের দিকে চেয়ে অকুণ্ঠিত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি নাকি এয়ার ফোর্সে যোগ দিতে চাচ্ছেন?

আয়োজন দেখেই অরুণাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার উপর প্রশ্নটির

অরুণাংশু বার দুই ঢোঁক গিলবার পর মুখ ফিরিয়ে বললে, আমি পরে বলব, অনু।

কিন্তু অনামিকা মাথা নেড়ে বেশ একটু জোর দিয়েই বললে, না, পরে নয়—আজই—এক্ষুনি আপনাকে কথা দিতে হবে।

মুখ নামিযে দু-তিন মিনিট কাল চুপ ক'রে ব'সে রইল অরুণাংশু; তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে বললে, বুঝেছি, অনু, আমার মা আবার তোমায় বিপদে ফেলেছেন।

কিন্তু এবারও অনামিকা প্রতিবাদ ক'রে বললে, না, তিনি আমায় কিছুই বলেন নি।

অরুণাংশু বিহ্বলের মত আবার কিছুক্ষণ অনামিকার মু'খর দিকে চেয়ে রইল; তার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়িযে বললে, থাক্ তবে, আর কারও কথা এর মধ্যে টেনে আনব না আমি। আর আমি নিজেও তোমায় কোন বিপদে ফেলব না,—যেটুকু করেছি তারই লজ্জা রাখবার ঠাঁই পাচ্ছি নে আমি। বেশ, তোমায় কথা দিলাম—যুদ্ধে আমি যাব না, আগেব মত ভবিষ্যতেও রাজনৈতিক ফ্রণ্টেই আমি কাজ কবব।

ব'লেই মুখ ফিরিয়ে সে জানলাব কাছে চ'লে গেল।

বৈশাখের দুপুব। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ কোথাও নেই। বোদে কলকাতা শহবটা তেতে উঠেছে,—হাওযা ছুটছে যেন আগুনেব হল্কা। এ দিকটাতে এমনিতেই লোকজনের বসতি কম,—এখন পথে একেবারেই লোক নেই। শব্দের মধ্যে বাসবিহাবী অ্যাভেনিউ থেকে মাঝে মাঝে ট্রামের ঘরঘব শব্দ অস্পষ্ট হযে ভেসে আসছে মুমূর্ষু পৃথিবীব অস্ফুট গোঙানির মত। অদূবে দেশপ্রিয় পার্ক মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করছে।

সেই দিকে চেয়ে অরুণাংশু কিছুক্ষণ ওই জানলাব ধারেই স্তব্ধ হযে দাঁড়িয়ে রইল; তার পর ফিরে আবার অনামিকার কাছে এসে তাব মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক রকম হাসি হেসে বললে, ভেবো না, অনু, আমা দ্বারা তোমাব একটুও ক্ষতি হবে না। একটা অসাধারণ, অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তোমায় আমি আত্মসাৎ করব না,—যাকে তুমি ভালবাস না, তারই স্ত্রী হবার দুর্ভাগ্য তোমায় ভোগ কবতে হবে না।

কৈফিয়ৎ আর দিতে হবে না। আপনি নিজেই জানেন যে, কোন দায়ই আপনি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন না। কিন্তু কথা আমি বাড়াতে চাই নে। কেবল আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনি? কি আপনি আমার কাছে চেয়েছিলেন যা পান নি?

অরুণাংশু মুখ তুলে অনামিকার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে; ক্ষোভের স্বরে বললে, এত দিনেও কিছুই যদি তোমায় বোঝাতে না পেরে থাকি, তবে আজও পারব না।

অনামিকার ঠোঁট দুখানি এক বার যেন অল্প একটু কেঁপে উঠল; কিন্তু শান্ত কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, আমিও তো ঠিক সেই কথাই বলতে পারি।

অরুণাংশু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত মুখ ফিরিয়ে বললে, তুমি!

অনামিকা চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বললে, কথা দিয়ে আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। এতে যদি সংশয় আপনার দূর না হয়, না-ই হবে। কিন্তু দোহাই আপনার, আমায় বিমুখ মনে ক'রে বিলাস-ব্যসনের ঘৃণ দিতে এসে আমার সঙ্গে নিজেকেও আর যেন ছোট করবেন না।—বলতে বলতে অনামিকার গলাটা কেঁপে গেল।

অরুণাংশু বিহ্বলের মত বললে, এ কি বলছ, অনু?

মুখখানি আরও একটু নত ক'রে অনামিকা উত্তর দিলে, আর সব দুঃখ আমি সইতে পারব; কিন্তু আমার মত তুচ্ছ একটি মেয়ের জন্যে আপনার জীবনের ব্রত যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে দুঃখ আমার কিছুতেই সইবে না।

অরুণাংশু স্তব্ধ হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যেমন হয়, স্বপ্নের ঘোরও চোখে লেগে থাকে, বাস্তবটাকেও অস্বীকার করা যায় না, তেমনি অবস্থা হ'ল তার। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখে তার কথাই ফুটল না; তার পরেও সংশয়ের স্বরেই সে বললে, এ কি সত্য! ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া যে অরুণাংশুটাকে তার নিজের বাপ-মা পর্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতে পারলে না, তাকেই তোমার ভাল লাগল!

অনামিকা মুখ তুললে না; কিন্তু মৃদু স্বরে সে বললে, বলেছি তো,

কিন্তু অনামিকার চোখ দুটি চাপা হাসির আলোকে চিকচিক ক'রে জ'লে উঠল। এক বার অরুণাংশুর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই পরক্ষণেই আবার চোখ নামিয়ে নিলে সে ; একটু দূরে স'রে গিয়ে শাড়ির একটা কোণ দুই হাতের কম্পিত আঙুল কটি দিয়ে দড়ি পাকাবার ভঙ্গিতে ঘোরাতে ঘোরাতে আবার কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, এ কদিন বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করেছেন আপনি। আমি খুশি হব মনে ক'রে এখন আবার উল্টো দিকে বাড়াবাড়ি শুরু করবেন না যেন, করতেই যদি হয় তো সে বিয়ের পরে করবেন।

প্রথমে অরুণাংশু কথাটা যেন বুঝতেই পারলে না ; কিন্তু একটু পরেই শব্দ ক'রে হেসে উঠে সে বললে, আবার প্রতিশ্রুতি চাও কেন, অনু ? আগেই তো কথা দিয়েছি যে, কোন মতেই তোমায় আর আমি বিব্রত করব না।

কিন্তু হাসি থামলে মুখখানাকে একটু অতিরিক্ত রকমেই গম্ভীর ক'রে সে আবার বললে, কিন্তু একটা বাড়াবাড়ি আজ আমি করতে চাই, অনু।

এবার অনামিকা বিস্মিত হয়ে বললে, কি ?

আজ কাকাবাবু ফিরে এলে, চল, দুজনে যুগলে তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্বাদ নিই গে।

বলতে বলতে চেষ্টা ক'রেও হাসি আর চাপতে না পেরে অরুণাংশু শেষ পর্যন্ত হেসেই ফেললে।

কিন্তু অনামিকা লাল হয়ে উঠে বললে, ছিঃ !

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে সে আবার বললে, আমার লজ্জা করে না বুঝি !

অরুণাংশু আবার শব্দ ক'রেই হেসে উঠে বললে, লজ্জা আবার কি ! আমিও তো তোমার সঙ্গেই থাকব।

দরকার নেই।—বলতে বলতে অনামিকা আরও একটু দূরে স'রে গেল ; কিন্তু সেখান থেকেই অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে আবার বললে, আপনি এখন দয়া ক'রে বাড়ি যান তো, বাবার ফিরবার সময় হয়ে এল।

অরুণাংশু কৌতুকের স্বরে বললে, যদি না যাই !

না হয় অনুকে ডেকে নিজেই জিজ্ঞেস কর না তুমি,—এখনই কথাটা পাকা হয়ে যাক।

ব'লেই প্রতুলবাবুর সম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই নিজেই তিনি 'অনু' 'অনু' বলে ডাকতে শুরু ক'রে দিলেন। অনামিকার সাড়া না পেয়ে শেষে নিজেই উঠে গিয়ে ভিতর থেকে তাকে ধ'রে নিয়ে এলেন তিনি; এসেই বললেন, আমায় দেখেই ও কোথায় পালিয়েছিল, জান, ঠাকুরপো?—একেবারে ভাঁড়ার ঘরে। কিন্তু আমার মত শক্ত পেয়াদার চোখ এড়ানো অত সোজা নয়,—ঠিক ধ'রে ফেলেছি আমি।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই প্রতুলবাবু বুঝতে পারলেন যে, মহামায়া দেবী মিথ্যা কথা বলেন নি। কিন্তু এ রকম একটা অবস্থার জন্য তিনি মোটেই তৈরি ছিলেন না। মাথাটা তাঁর গুলিয়ে গেল; গলাটা শুকিয়ে হয়ে গেল যেন কাঠ। অনেকখানি চেষ্টা ক'রে অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনু, অরুণ এখানে এসেছিল না কি?

অনামিকা মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বললে, হ্যাঁ, বাবা, আমিই ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

মহামায়া দেবী স্মিত মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, শুধু ওইটুক বললেই হবে না, মা,—একেবারে পাকা কথা আজ আমি আদায় ক'রে নিতে এসেছি, দিন-ক্ষণ ঠিক ক'রে তবে যাব।

অনামিকা কথা বললে না, কিন্তু তার আরক্ত মুখখানি আরও লাল হয়ে উঠল।

দেখে প্রতুলবাবু নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, থাক্, বউদি, ওকে আর কেন মিছামিছি—

না, ঠাকুরপো। মহামায়া দেবী বাধা দিয়ে বললেন, যতই দেরি করছি ততই সব অনর্থ ঘটছে। আজ আমি বাপ-মেয়ে দুজনের সামনেই কথাটা পাকা ক'রে যেতে চাই। বল, অনু, বিয়ের দিন আমি ঠিক করব তো?

বাপের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখলে অনামিকা; তার পর ঘাড়টা একটু কাত ক'রে অস্ফুট স্বরে বললে, করুন।—ব'লেই সে উঠে ছুটে পালিয়ে গেল।

মত রোগা মানুষকে খালি বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আমি এখানে থাকতে পারি নাকি!

রমেনবাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন, তবে তুমিও চল। বাড়িতে বিয়ের জন্য আয়োজনও তো করতে হবে।

রাত্রে মহামায়া দেবীর সাক্ষাতেই রমেনবাবু প্রতুলবাবুকে বললেন, কথা আমাদের হয়েই রইল, প্রতুল; একটা ভাল দিন পেলেই আমরা দুজনে তোমার বাড়িতে গিয়ে বিধিমত আমার অনু-মাকে আশীর্বাদ ক'রে আসব। কিন্তু আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে, ভাই; বিয়েটা আপাতত কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকবে।

প্রতুলবাবুর কাছে এটা একটা অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ; তিনি এমন চমকে উঠলেন যে, উত্তরে একটা কথাও তিনি মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারলেন না।

একটু পরে রমেনবাবুই আবার বললেন, পারলে একটা দিনও আমি দেরি করতাম না; কিন্তু এমনি দুর্দৈব যে, এখন কিছুদিন বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।

কিছু একটা কথা বলবার জন্যই যেন প্রতুলবাবু বললেন, কেন, রমেনদা?

আড়চোখে মহামায়া দেবীর মুখের অবস্থাটা দেখে নিয়ে রমেনবাবু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, তোমরা তো এ সব মান না, ভাই,—বিলাত থেকে তুমি সাহেব হয়ে ফিরে এসেছ। কিন্তু আমাদের মত সেকেলে মানুষ এ সব না মেনে পারে না। দৈবজ্ঞ বলেছেন, সামনে ক মাস অকাল; তার উপর অরুণের গ্রহও অপ্রসন্ন হয়ে আছেন; এ সময়ে ওর বিয়ে দিলে তার ফল শুভ না-ও হতে পারে।

প্রতুলবাবু ও মহামায়া দেবী এক সঙ্গেই চমকে উঠলেন। প্রতুলবাবু বললেন, তা হ'লে তো বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না!

মহামায়া দেবী বললেন, এ সব কথা তুমি আমায় আগে বল নি কেন?

উত্তরে রমেনবাবু অভিযোগের মত ক'রে বললেন, বলবার অবসর তুমি আমায় দিচ্ছ কোথায়? চলেছ তো পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে; আমি পায়ে হেঁটে তোমার নাগাল পাব কেন!

ফিরে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন, খুব বেশি

তার বর্তমানের জীবনটা ছিল নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য। হুগলীতে সে কেবল নার্স ই ছিল না, ছিল সেখানকার মজদুর-সংঘের অন্যতম সক্রিয় কর্মীও। তার উপর সেখানে সে আবার ছিল সকলের দিদিমণি। বৈষম্য-ভিত্তিক এই পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজটাকে ভেঙে দুঃখ, বঞ্চনা আর দারিদ্র্যমুক্ত অভিনব এক সমাজ সৃষ্টি করবার সুমধুর এক স্বপ্নের উন্মাদনায় আরও অনেকের সঙ্গে সেখানে সে দেশ ও দশের কাজে জীবনটাকে উৎসর্গ করতে পেরেছিল। সেখানে তার হাসপাতালের কাজ আর বাইরের রোগীর সেবা ছিল মহত্তর জীবনধর্মের সেই অনন্যচিত্ত অনুশীলনেরই অবিচ্ছেদ্য একটা অঙ্গ। কিন্তু কলকাতায় যে জীবন সে যাপন করছিল, তার স্বরূপটাই ছিল অন্য রকমের—এ যেন প্রাণহীন একটা দেহ মাত্র। সে ছিল একটা ব্রত—এ একটা জীবিকা; সে ছিল নিরলস একটা সাধনা—এ নিছকই কায়িক পরিশ্রম; সে ছিল সুমহান একটা আত্ম-সমর্পণ—এ কেবলই উদরচর্যা। জীবনধর্ম থেকে বিশ্লিষ্ট দার্শনিক ভিত্তিহীন কায়িক পরিশ্রমের কাজটা রোগীর সেবা হ'লেও সুভদ্রার মন ওর মধ্যে যেন এক ফোঁটা মধুও খুঁজে পাচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই তার মনে হচ্ছিল যে, আদর্শের সঙ্গে যোগ হারিয়ে তার জীবনটা একেবারেই যেন নিরর্থক হয়ে গিয়েছে।

সরস মাটির বুক থেকে উপড়ে-তোলা তাজা পরিণত লতাটির মত সুভদ্রা তার পেশাদার নার্সের শ্রমসর্বস্ব জীবনের নীরস কঠিন মাটির মধ্যে চেষ্টা ক'রেও শিকড় গেড়ে পাকা হয়ে বসতে পারছিল না।

হুগলীর কথা প্রায়ই তার মনে পড়ত। সেই কারখানা, সেই হাসপাতাল, সেই বস্তি, সেই তার গুণমুগ্ধ ভক্তের দল—'দিদিমণি' বলতেই প্রতি বারেই চোখ যাদের ছলছল ক'রে আসত। মনে হ'লেই বুকটা তার টনটন করতে থাকত; মাঝে মাঝে তার অনুতাপ হ'ত—অন্তত শ্যামাচরণের কাছেও নিজের ঠিকানাটা যদি সে রেখে আসত তবে ওই সূক্ষ্ম সুতোটুকু অনুসরণ ক'রেই কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এখানেও তার সঙ্গে দেখা করতে আসত—হয়তো শ্যামাচরণ, হয়তো সুবোধ, হয়তো অরুণাংশুও,—কে জানে!

তার উপর আবার নিজের সমস্যা। নিজের শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে তার অস্বস্তির অন্ত ছিল না। তারই দেহ থেকে তিল তিল ক'রে উপাদান আহরণ ক'রে তার জরায়ুর মধ্যে সন্তান তার ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে—নিজের

বাকি কথাগুলি তার মুখেই আটকে গেল; ঠিক সেই সময়েই বাইরের দিকের খোলা দরজা দিয়ে অপরিচিত একটি যুবক ঘরে এসে ঢুকল।

নিজেকে সামলে নিয়ে কমলা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কাকে চান আপনি?

যুবকটি কুণ্ঠিত স্বরে বললে, সুভদ্রা দেবী কি এই বাড়িতে থাকেন?

হ্যাঁ থাকেন।—কমলা উত্তরে বললে, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

হুগলী থেকে।

হুগলী!

কমলার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ অতিরিক্ত রকমে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এমন ভাবে যুবকটির দিকে সে তাকাল যেন চিড়িয়াখানা কি ওই রকমের একটা জায়গায় অদৃষ্টপূর্ব একটা জানোয়ারকে দেখে ওর কৌতুক আর কৌতূহল এক সঙ্গেই তীব্র হয়ে উঠেছে।

যুবকটি কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি কি তাকে কল্ দিতে এসেছেন?

আজ্ঞে না।

তবে?

অমনি একবার—

দেখা করতে এসেছেন বুঝি?—বলতে বলতে কমলার চোখের কোণে এবার দুষ্টামির হাসি চিক্‌চিক্ ক'রে জ্ব'লে উঠল।

যুবকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে না; অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এই বাড়িতেই থাকেন তো?

হ্যাঁ।—কমলা এবার প্রকাশ্যেই হেসে ফেলে বললে, ভুল হয় নি আপনার। তিনি এখানেই থাকেন এবং এখন বাড়িতেই আছেন; বসুন আপনি, আমি এক্ষুনি তাঁকে খবর দিচ্ছি। ও কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না—

বলতে বলতে কমলা নিজেই উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু তখনই আবার তার চোখ গিয়ে পড়ল তার নিজের মক্কেলের উপর, লোকটি তখনও ঠায় ব'সে রয়েছে।

বিরক্তিতে কমলার মুখখানা আবার কালো হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে

কিন্তু এতেও কমলা তাকে ছেড়ে দিলে না ; কেবল তার বাহুবন্ধনটিকে ঈষৎ একটু আল্‌গা ক'রে সুভদ্রার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললে, শীগগির যা, তোকে ডাকছেন।

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কে ?

কে আবার ! কমলা ভ্রূভঙ্গি ক'রে উত্তর দিলে, তোমার উনি।

কে !

তোমার উনি গো, যার জন্য যৌবনে তুমি যোগিনী হয়েছ।

ধেৎ ! সুভদ্রা মুখ লাল ক'রে একটা ঝটকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে, একটু দূরে স'রে গিয়ে বললে, বাজে ব'কস নে বলছি।

বাজে নয় গো।—কমলা মুখ-চোখের বিশেষ একটা ভঙ্গি ক'রে বললে, সত্যি তোমার 'উনি' এসেছেন হুগলী থেকে,—আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। তাঁকে বসিয়েই তো আমি আসছি।

চক্ষের পলকে সুভদ্রার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল ; শরীরটা হয়ে গেল যেন পাথর ; উত্তরে একটি কথাও বলতে না পেরে পাথরের মূর্তির মতই নিষ্পলক চোখে কমলার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে।

দেখে কমলাই মুচকি হেসে সুভদ্রার চিবুকটা আলগোছে একবার নেড়ে দিয়ে সকৌতুক কণ্ঠে বললে, হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে ? যা শীগগির।

এতেই সুভদ্রার চৈতন্য ফিরে এল। পাশের চৌকিখানার উপর ব'সে প'ড়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, যাও কমলা, এখন আমায় বিরক্ত ক'রো না। আমার কাজ আছে।

কমলার চোখ আর ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু আরও বেশি তীক্ষ্ণ, আরও বেশি চঞ্চল হয়ে উঠল ; কিন্তু গাম্ভীর্যের ভাণ ক'রে সে বললে, আমিও কাজের কথাই তোমায় বলতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন তার সঙ্গে দেখা করবে না, তখন যাই, ভদ্রলোককে বিদায় ক'রে আসি।

ব'লেই মুখ ফিরিয়ে সে চলবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু সুভদ্রাই তাকে ডেকে ফিরিয়ে বললে, সত্যি ক'রে বল্‌ তো কমলা, কে এসেছে ?

কমলা হেসে ফেলে বললে, বললাম তো, 'কল্কি' দিতে আসেন নি, হুগলী

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, সুবোধবাবু, কে এসেছে তা বুঝতেই পারছিলাম না কিনা ?

সুবোধ হাত ওটিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমায় মাপ করবেন, হঠাৎ এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম।

ওমা, সে কি কথা !—সুভদ্রা নিজেও কুণ্ঠিত হয়ে বললে, বিরক্ত করলেন কি বলছেন ? আপনি এসেছেন, এ তো আমার সৌভাগ্য, কার মুখ দেখেই না জানি আজ উঠেছিলাম !—বলতে বলতে সুভদ্রার মুখখানি সত্যই আন্তরিক আনন্দের আভায় ঝলমল ক'রে জ্ব'লে উঠল। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে সে আবার বললে, ও কি, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে ! বসুন।

সুভদ্রার মুখের কঠিন গাম্ভীর্য লক্ষ্য ক'রে সুবোধ প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল ; এবার কতকটা আশ্বস্ত হ'ল সে ; আসনে বসবার পর আবার যখন সে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল, তখন সে মুখখানি আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সত্যি।—সুভদ্রাই আবার বললে, কমলা গিয়ে আমায় বললে, হুগলী থেকে কে এক জন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বিশ্বাসই হ'ল না আমার, হবেই বা কেমন ক'রে ? কেউ তো কখনও আসে না !

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আপনার ঠিকানাটা কেউ জানে না কিনা, তাই—

এবার সুভদ্রাই অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে ; বললে, সত্যি, ভারি অন্যায় হয়ে গিয়েছে আমার। আসার সময় কিছুই তো ঠিক ছিল না, পরে লিখি লিখি ক'রেও চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু—

ব'লে আবার মুখ তুলে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনিই বা আমার ঠিকানা জানলেন কেমন ক'রে ?

সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, সে এক রকম গোয়েন্দাগিরি ক'রে। কেউ কিছু বলতে পারছে না দেখে গেলাম আন্দাজ ক'রে ডাক্তার চৌধুরীর কাছে। তিনিও প্রথমে কিছুতেই বলবেন না, অনেক পিড়াপিড়ি করতে তবে বললেন।

তা বটে।—সুভদ্রা আবার অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে ; ঢোঁক গিলে বললে, তাঁকেও আমি নিষেধ ক'রে এসেছিলাম, শরীরটা তখন খুবই খারাপ ছিল কিনা, নিরিবিলির দরকার ছিল আমার।

সুবোধ বললে, হ্যাঁ, শ্যামাচরণদাও তাই বলছিল বটে।

শ্যামাচরণদা!—ব'লে চমকে মুখ তুলে তাকাল সুভদ্রা; চোখ দুটি তার আবার জ্ব'লে উঠল; আগ্রহের স্বরে সে বললে, কেমন আছে শ্যামাচরণদা? বউদি কেমন? ছেলেমেয়েরা? বলুন, সুবোধবাবু, হুগলীর সব খবর বলুন।

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, সে তো এক মহাভারত, সুভদ্রা দেবী, শুরু করলে সারা দিনেও তো শেষ হবে না।

না, বলুন আপনি।—সুভদ্রা জিদের স্বরে বললে। তার পর নিজেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলে, কারখানার কথা, হাসপাতালের কথা, তার চেনা মেয়ে-পুরুষ, এমন কি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কথা, সকলের শেষে ইউনিয়নের কথা।

ওই ইউনিয়নের প্রসঙ্গেই অরুণাংশুর কথা এসে গেল। কিন্তু তাতেই আলোচনার স্রোতের মুখে হঠাৎ যেন একখানা জগদ্দল পাথর চাপা পড়ল। অরুণাংশুর নাম শুনেই সুভদ্রার মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর, এমন কি, যেন কঠিন হয়ে উঠল। সে আর কোন প্রশ্ন করলে না, সুবোধও দু-একটি কথা ব'লেই আলোচনাটার উপর যবনিকা টেনে দেবার উদ্দেশ্যেই নিজে থেকেই বললে, থাক্, সুভদ্রা দেবী, রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে আপনি যখন চ'লেই এসেছেন, তখন এ সব নোংরামির কথা আপনি আর না-ই শুনলেন। আর এ সব কথা শোনাবার জন্ত আমি আপনার কাছে আসিও নি। যে কথা বলতে এসেছি, তাই ব'লেই আমি বিদায় নিতে চাই।

অরুণাংশুর কথা উঠতেই সুভদ্রা মুখ নামিয়েছিল; কিন্তু শেষের কথাটা শুনে আবার মুখ তুলে বিস্ময়ের স্বরে সে বললে, কি কথা, সুবোধবাবু?

সঙ্গে সঙ্গেই সুবোধ উত্তর দিতে পারলে না। একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে সে, একবার নিজের পায়ের জুতার দিকে; তার পর আবার সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আমায় মাপ করতে পারবেন, সুভদ্রা দেবী? সে রাত্রির অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্তে আমার নিজেরই লজ্জা আর অনুতাপের অবধি নেই।

চক্ষের পলকে সুভদ্রার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তার মুখের উপর ছুটে

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, না না, চা চাই নে আমার।

সুভদ্রা বিস্ময়ের মত থমকে দাঁড়াল; সংশয়ের স্বরে বললে, সত্যি, চা খাবেন না আপনি?

সুবোধ উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলে, না, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন যাই।

সুভদ্রা তথাপি আরও কিছুক্ষণ সংশয়ের চোখে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর হেসে ফেলে বললে; এ তো আপনার চিরকালের রোগ। তা বেশ, চা না হয় না-ই খেলেন। কিন্তু তাই ব'লেই এক্ষুনি যেতে পাবেন না। বসুন আপনি, আপনার নিজের কথা কিছুই তো শোনা হয় নি এখনও; তাই বলুন এবার; বলুন আপনার বাড়ির খবর। সব ভাল তো সেখানে?

সুভদ্রার অনুরোধ সুবোধ ঠেলতে পারলে না। আবার বসতে হ'ল তাকে। সুভদ্রাও বসল; ব'সে আবার বললে, বাড়ির সবাই ভাল আছেন তো?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, বহুবচন আর কেন, সুভদ্রা দেবী? আমার তো বাড়িতে থাকবার মত এক ঠাকুরমা। তা তিনি এখন ভালমন্দের অতীত অবস্থায় চ'লে গিয়েছেন, বৈতরণীর তীরে খেয়া নৌকার অপেক্ষায় আছেন আর কি!

সুভদ্রার মুখ ম্লান হয়ে গেল; একটু চুপ ক'রে থেকে অনুতপ্তের মত সে বললে, সত্যি, কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

সুবোধ উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল। একটু পরে সুভদ্রাই আবার জিজ্ঞাসা করলে, তা বাড়িতে কি তিনি একেবারে একা থাকেন? আর কেউ সেখানে নেই?

সুবোধ বললে, না।

কেন, সুবোধবাবু? সুভদ্রা আবার জিজ্ঞাসা করলে, এমন কেউ কি আপনাদের নেই, যিনি তাঁর কাছে থাকতে পারেন?

সুবোধ বললে, তা হয়তো আছে। আমি তাদেরই দু-একজনকে বাড়িতে রেখে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঠাকুমাই রাজী হলেন না।

সংগ্রামের সার্থকতাসমুজ্জ্বল উপসংহারের ভীষণ মধুর একখানি ছবি কথায় ফুটিয়ে তুলে সে যেন সুভদ্রাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিলে।

দুই বিস্ফারিত চোখের অচঞ্চল স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুবোধের মুখের উপর বিন্যস্ত রেখে সুভদ্রা নিঃশব্দে সব কথা শুনে গেল। কিন্তু সুবোধ নীরব হবার পর সে হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে বললে, কিন্তু, সুবোধবাবু, আন্দোলন আসবার আগেই যদি আপনি ম'রে যান, তা হ'লে মরণ-বঁধুর সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে কেমন ক'রে।

কথাটা বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের স্বরে সুবোধ বললে, তার মানে?

সুভদ্রা হাসি থামিয়ে বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, বাড়িতে আপনার আয়না-চিরুনির বালাই তো নেই! যদি থাকত আর আরশিতে নিজের চেহারাটা নিজে যদি আপনি দেখতে পেতেন, তবে আমার কথার মানে আর আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হ'ত না।

সুবোধ অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ওটা আমার দোষ নয়; সুভদ্রা দেবী, ম্যালেরিয়ার।

অ্যাঁ!—সুভদ্রা চমকে উঠে বললে, ম্যালেরিয়া আপনার হয়েছে নাকি?

সুবোধ কিন্তু এবার হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, হ্যাঁ, সুভদ্রা দেবী, দেশে যাবার সুরস্কার আর কি! মনে হচ্ছে যে, আমার প্রতি ওর স্নেহ আমার ঠাকুমার স্নেহের চেয়েও বেশি। ঠাকুমাকে ছেড়ে এসেছি, কিন্তু ওকে ছাড়তে পারি নি; পরম স্নেহভরে উনি হুগলী পর্যন্ত সঙ্গেই এসেছেন।

সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল; তার পর হঠাৎ খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে ব্যাকুল স্বরে সে বললে, না, সুবোধবাবু, নিজের দেহের এমন অযত্ন করবেন না আপনি। ম্যালেরিয়া বড় খারাপ ব্যারাম, আপনি উপযুক্ত চিকিৎসা করান।

তা করাচ্ছি।—সুবোধ স্মিত মুখে উত্তর দিলে, দেশে কুইনাইন পাওয়া যায় না, তাই চিকিৎসা সম্ভব হয় নি। এখানে রোজ কুইনাইন খাচ্ছি।

আরও দু-চারটি কথার পর সুবোধ খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আজ তা হ'লে আমি আসি; সুভদ্রা দেবী, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।

সুভদ্রা চমকে উঠল ; বাইরের দিকে তাকিয়ে সে-ও বুঝতে পারলে যে, সত্যই বেলা অনেক হয়েছে। ফিরে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, অত দূরে যাবেন, সুবোধবাবু, চা না খান, একটু জলখাবার—

না, না।—ব'লে সুবোধ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল ; বললে, কিচ্ছু দরকার নেই।

সুভদ্রাও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তবে আর কি বলব! আসুন তবে ; কিন্তু শরীরটাকে আগের মত অযত্ন করবেন না।

সুবোধ কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে ; কিন্তু পরক্ষণেই আবার চোখ তুলে সে বললে, শ্যামাচরণদার বড় সাধ আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবে সে। তাকে আপনি আপনার ঠিকানা দিয়ে আসেন নি ব'লে তার দুঃখের অন্ত নেই, আর অভিমানও নিতান্ত কম নয়। তাকে আপনার ঠিকানাটা জানাতে পারি কি ?

সুভদ্রা প্রথমে অপরাধীর মত মুখ নামিয়েছিল, পরে মুখ তুলে বললে, তাকে আপনি সঙ্গেই নিয়ে এলেন না কেন ?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আজ আপনার সঙ্গে আমার নিজের কথা ছিল কি না, তাই তাকে আনি নি, কিছু ব'লেও আসি নি তাকে। এখন যদি আপনি অনুমতি—

তাকে পাঠিয়ে দেবেন আপনি।—সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে, বলবেন—আমি তাকে ডেকেছি।

একটু থেমে অসাধারণ রকমের গম্ভীর স্বরে সে আবার বললে, কিন্তু আর কাউকে কিছু জানাবেন না যেন, শ্যামাচরণদাকেও সতর্ক ক'রে দেবেন।

সুবোধ বিব্রতের মত কয়েক সেকেণ্ড কাল সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমার আর একটা কথার উত্তর দেবেন, সুভদ্রা দেবী ?

সুভদ্রা কতকটা বিস্মিত, কতকটা শঙ্কিতের মত সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি ?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, অরুণাংশুর সঙ্গে দেখা হয় আপনার ?

তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে সুভদ্রা বললে, না।

আবার কিছুক্ষণ সুবোধ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; তার পর সুপ্তোত্থিতের মত বললে, আচ্ছা, আমি এখন তা হ'লে আসি, নমস্কার।

কিন্তু দোরের কাছে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল সে ; ফিরে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, আপনার অনুমতি ছাড়াই আরও একটা কথা আপনাকে বলব, সুভদ্রা দেবী। আমি জানি যে, নিজের জন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন আপনার নেই। কিন্তু আপনার মধ্যে যে আর একটি জীবনের সঞ্চার হয়েছে, তার জন্য কারও সাহায্যের দরকার যদি কোন দিন আপনার হয়, সে দিন দয়া ক'রে আমায় স্মরণ করবেন।

সুভদ্রার মুখে কোন উত্তর ফুটল না। সুবোধ চ'লে যাবার পরেও আরও মিনিট দশেক কাল ওই ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে। আসবার জন্য যেমন হয়েছিল, উপরে ফিরে যাবার জন্যও তেমনি নিজেকে তার চেষ্টা ক'রে তৈরি ক'রে নিতে হ'ল। কিন্তু সহজ সে হতে পারলে না। তার মুখের দিকে চেয়ে কমলা ভড়কে গেল, সে মুখ যেমন গম্ভীর, তেমনি কঠিন। বাছা বাছা, চোখা চোখা যত সব কথা সে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল, সে সব যেন তার গলায় আটকে গেল ; কোনও রকমে মুখের হাসিটুকু বজায় রেখে সে শুধু বললে, কি গো, ঝগড়া মিটল তোমাদের ?

ভুরু কুঁচকে কমলার মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা জলদ গম্ভীর স্বরে বললে, এ সব কথা নিয়ে অমন হালকা ঠাট্টা ক'রো না, কমলা।—ব'লেই তার পাশ কাটিয়ে সে তার নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

সুভদ্রার ভাব দেখে কমলা সে দিন আর সাহস ক'রে পরিহাস করতে পারে নি। খানিক পরে সুভদ্রা নিজেই তাকে সুবোধের নাম আর পরিচয় সংক্ষেপে শুনিয়ে দিয়েছিল ; ব্যাখ্যা হিসাবে বলেছিল যে, সে তার বন্ধু। কিন্তু ওই বলার ধরনটাও ছিল এত বেশি গম্ভীর যে, ওই 'বন্ধু' কথাটার উপরেও কমলা আর কোন মন্তব্য করতে সাহস পায় নি। তার পর ওই প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে আর কোন কথাই হয় নি ; সে দিনের অসাধারণ ঘটনাটাকে ভুলতে না পারলেও কথা আর বাহ্যিক ব্যবহারে কমলা সেটাকে উপেক্ষা ক'রেই চলছিল।

কথাটা শুনেই কমলা হেসে ফেলেছিল ; কিন্তু তাড়াতাড়ি সেটা গোপন করে গম্ভীর স্বরে সে বললে, উনি বুঝি তোমায় কল্ দিয়ে পাঠিয়েছেন ?

না।—সুভদ্রা শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, কেউ আমায় কল্ দেয় নি। আমি নিজেই যাচ্ছি আমার বন্ধুর সেবা করতে।

চাকরের হাতে জিনিসপত্র নীচে পাঠিয়ে দিয়ে কমলাকে সে আবার বললে, আমার ফিরতে কদিন দেরি হতে পারে, কমলা ; এর মধ্যে যদি তেমন কোন দরকার উপস্থিত হয়, হুগলীতে আমায় একটা খবর দিও।

কমলার ঠোঁটের কোণে আবার একটু হাসি ফুটে উঠল ; কিন্তু সেটুকু ওখানেই চেপে রেখে সে বললে, খবর দিতে পারব ঠিকই, কিন্তু খবর দেব কোথায় ? খামের উপর সুভদ্রা দেবীর নাম লিখে চিঠি ছেড়ে দিলেই তা একেবারে তোমার কোলের উপর গিয়ে পড়বে নাকি ?

এবার সুভদ্রাও হেসে ফেলে বললে, না, তা পড়বে না। কিন্তু সে জন্য ভাবনা নেই তোমার। ঠিকানা আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি। তবে অকারণে ফিরবার তাগিদ দিয়ে চিঠি পাঠিও না যেন, আর দয়া ক'রে নিজে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'য়ো না।

শ্যামাচরণের সঙ্গে সুভদ্রা যখন হুগলীতে তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন দুপুর পার হয়ে গিয়েছে। উঠানে ঢুকতেই তারার সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল।

ছোট্ট উঠানটুকুর মধ্যে একা একাই কি একটা খেলা জমিয়ে নিয়েছিল সে ; সুভদ্রাকে দেখে প্রথমে সে অবাক হয়ে গেল ; কিন্তু তার পরেই উল্লাসের স্বরে পিসিমা ব'লে ছুটে গিয়ে সে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

সুভদ্রাও হাসিমুখে তাকে কোলে তুলে নিতে যাচ্ছিল ; কিন্তু তার আগেই শ্যামাচরণ হাত ধ'রে তারাকে দূরে সরিয়ে দিলে ; বললে, না, মা, এখন গোলমাল ক'রো না ; আগে বল তো, তোমার কাকাবাবু কেমন আছেন ?

ভাল না।—মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে তারা উত্তর দিলে, কেবল ছটফট করছে আর বিড়বিড় ক'রে কি সব বকছে !

শ্যামাচরণ চোখ লাল ক'রে বললে, তবে তুই তার কাছে না থেকে বাইরে খেলা করছিস যে ?

আমার ভয় করে না বুঝি!—তারা কাঁদ কাঁদ হয়ে উত্তর দিলে।

থাক্ থাক্।—সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে, চল, শ্যামাচরণদা, আমরাই দেখি গে।

কিন্তু শ্যামাচরণ একলাই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল; সুভদ্রাকে ব'লে গেল, তুমি একটু দাঁড়াও, দিদিমণি, আমি আগে দেখে আসি।

শ্যামাচরণ চ'লে যেতেই তারা সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে নিজে থেকেই আবার বললে, সত্যি, পিসিমা, বড্ড ভয় করছিল আমার। মা এসেছিল বার্লি নিয়ে; কিন্তু কাকাবাবু একটু খেয়েই সব হুড়হুড় ক'রে বমি ক'রে ফেললে।

সুভদ্রার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল; শ্যামাচরণের ডাকের জন্য আর অপেক্ষা না ক'রেই সে-ও ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

খোলার ঘর, জানালা একটিও নেই, স্যাঁৎসেঁতে কাঁচা মেঝে, ভিতরটা অন্ধকার, তার উপর আবার কেমন একটা ভাপসা গন্ধ। সুভদ্রার কাছে অবশ্য এ দৃশ্য নূতন নয়, তবু ঘরে ঢুকতেই মনটা তার দ'মে গেল। দেখবার জন্য চোখ দুটিকে বার বার ছোট-বড় ক'রে বেশ খানিকটা চেষ্টা করতে হ'ল তাকে। তার পর সুবোধের চেহারাটা যখন তার চোখে পড়ল, তখন তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

দড়ির খাটিয়ার উপর খালি একখানা শতরঞ্চি পাতা; মাথার বালিশ নীচে মাটিতে প'ড়ে গিয়েছে; খাটিয়ার মাঝখানটা ঝুলে পড়েছে জেলেদের জালের মত। সেই বিছানার উপর শুয়ে সুবোধ জ্বরের ঘোরে কেবলই ছটফট করছে। তার কোমর পর্যন্ত একখানা কাঁথা দিয়ে ঢাকা। একখানা কম্বল আগে বোধ হয় গায়েই ছিল, এখন পায়ের কাছে বিশৃঙ্খল হয়ে প'ড়ে রয়েছে। একটা পা খোলা, আর একটা পা কম্বলের একটা কোণের সঙ্গে খাটিয়ার পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। মাথার কাছে খাটিয়ার নীচে একটা পিতলের ঘটি কাত হয়ে প'ড়ে রয়েছে, তার চারদিকে কাঁচা মাটি জল পেয়ে কাদা হয়ে গিয়েছে।

খাটিয়ার দিকে তাকিয়েই সুভদ্রা থমকে দাঁড়িয়ে ছিল; তার মনের ভাবটা আন্দাজ ক'রেই শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমি আজ ছিলাম না কিনা, কিছুই আজ গোছগাছ করাও হয় নি।

ও সুবোধবাবু!—এবার শ্যামাচরণ তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, দেখুন তো চেয়ে, দিদিমণি এসেছে যে!

সুবোধ অস্থির চোখে একবার শ্যামাচরণের মুখের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ বুজল; ঠোঁট নেড়ে একবার কি যেন সে বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু মুখে তার কথা ফুটল না; জিভ, ঠোঁট, দাঁত, সব একত্র মিলিয়ে তিন-চার বার অস্ফুট চুক চুক শব্দ ক'রে হঠাৎ সে পাশ ফিরল। গায়ের কাঁথাখানা এবার তার হাঁটুর নীচে চাপা প'ড়ে গেল; থুতনিটা গিয়ে মিলল প্রায় বুকের সঙ্গে।

একটু জল আন তো, শ্যামাচরণদা।—সুভদ্রা শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে বললে।

জল আসতে আসতে বিছানাটা সে ঠিক ক'রে দিলে; সুবোধের মাথাটা আলগোছে তুলে দিলে বালিশের উপর; কাঁথা আর কম্বল একত্র ক'রে বুক পর্যন্ত টেনে দিলে; তার পর নিজে তার বুকের কাছে ব'সে বাঁ হাত দিয়ে মাথাটাকে ঘিরে চিবুক ধ'রে ডান হাতে ছোট জলের গ্লাসটি তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে, জল খান তো, সুবোধবাবু, হাঁ করুন। এ কি, নড়ছেন কেন? খুলুন, মুখ খুলুন, হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে।

প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জল ঢেলে সুবোধের শুকনো ঠোঁট দুটিকে সে ভিজিয়ে দিলে; তার পর অল্প অল্প ক'রে মুখের মধ্যে সে জল ঢেলে দিতে লাগল; একটু পরেই সুবোধ নিজেই দুই হাত দিয়ে গ্লাসটির সঙ্গে সুভদ্রার হাতখানাকেও চেপে ধ'রে মাথাটা একটু তুলে সবটুকু জল এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেললে।

খালি গ্লাসটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আঁচল দিয়ে সুবোধের মুখ মুছে দিয়ে সুভদ্রা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কেমন লাগছে এখন?

সুবোধ কোন উত্তর দিলে না, কিন্তু তার অস্থির চোখ দুটি বার বার সুভদ্রার মুখের উপর গিয়ে পড়তে লাগল।

আমায় চিনতে পারছেন না আপনি?—সুভদ্রা আবার তার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে।

এবারও সুবোধ উত্তর দিলে না; আরও কয়েক বার উদ্‌ভ্রান্তের মত

করতে না পেরেই যেন সে অজ্ঞান হয়ে গেল। আবার জ্ঞান যখন হ'ল, তখন শ্যামাচরণকে সে আর কাছে দেখতে পেলে না; দেখলে শ্যামাচরণের জায়গায় তার মজদুর-সংঘের সদস্য মহাবীরের জাঁদরেল স্ত্রী রামরতিয়া এসে দাঁড়িয়েছে; তার হাতে মস্ত একটা ঝাঁটা,—ওই ঝাঁটা দিয়ে রামরতিয়া তাকে ভয় দেখাচ্ছে, এক্ষুনি হয়তো মুখের উপর সপাং ক'রে ঝাঁটার বাড়ি পড়বে।

ঝাঁটা নয়, একটা বাটি;—রামরতিয়া নয়, সারদা। ভয় পেয়ে চোখ মেলতেই সুবোধ দেখলে সারদা একটা বাটি হাতে নিয়ে তার খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে; তাকেই ডেকে বলছে, বার্লি এনেছি, সুবোধবাবু, চট ক'রে খেয়ে ফেলুন তো।

কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত চেয়ে রইল সুবোধ; কিন্তু এটা যে স্বপ্ন নয়, তা ঠিক ঠিক বুঝতেই তৎক্ষণাৎ চোখ বুজে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে; বিরক্ত কণ্ঠে বললে, না, খাব না।

ওমা! না খেলে বাঁচবেন কি ক'রে!—সারদা সুর চড়িয়ে বললে, না না, সুবোধবাবু, বার্লিটুকু খেয়ে ফেলুন। নিন, লেবুর রস মিশিয়ে দিয়েছি, বেশ লাগবে খেতে, উঠে বসুন তো একবার।

সারদার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই বুঝেই সুবোধ কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল। কিন্তু এক চুমুকের বেশি সে খেতে পারলে না; আর সেটুকুও পরের মুহূর্তেই বমি হয়ে বের হয়ে গেল। সারদা হা-হা ক'রে উঠল, কিন্তু সুবোধ তার মুখের দিকে চেয়েও দেখলে না; জলের ঘটিটাকে মুখের কাছ থেকে হাত দিয়ে সরিয়ে মুখ না মুছেই তৎক্ষণাৎ সে আবার শুয়ে পড়ল। বার্লির বাটি আর সারদার মুখ কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল, সে তার হদিসই পেলে না। চোখ বুজতেই অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেল সে,—ভেসে উঠল গিয়ে সেই ছায়ার জগতে।

ঘরবাড়ি নেই, গাছপালা নেই, মাটিতে একগাছা সবুজ ঘাস পর্যন্ত নেই, আছে কেবল দিগন্তবিস্তৃত ধূসর, উষর, বন্ধুর একটা মাঠ। সুবোধের মনে হ'ল যে, সেই মাঠের এক দিকে সারিবন্দী অবস্থায় ট্যাঙ্কের মিছিল চলেছে, তাদের সবগুলি কামানের লক্ষ্য যেন সে নিজে। ভয় পেয়ে বিপরীত দিকে চোখ ফিরাতেই আবার সে দেখতে পেলে—ঝকঝকে সঙিন-পরা বন্দুক ঘাড়ে

নিয়ে উর্দি-পরা এক দল পদাতিক সৈন্ত সেখানে কুচ-কাওয়াজ করছে ; এক জন অফিসার লম্বা একটা বেত আস্ফালন করতে করতে ক্রমাগতই কেবল ব'লে যাচ্ছে, লেফ্‌ট-রাইট, লেফ্‌ট-রাইট, লেফ্‌ট-রাইট ; তার মুখখানা যেন অরুণাংশুর মত। সুবোধ সেই দিকে চোখ ফিরাতেই সে লোকটি তার মুখের দিকে চেয়ে হি-হি ক'রে হেসে উঠল। শিউরে উঠে সুবোধ উপরের দিকে তাকাল ; সেখানে আকাশ নেই, কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন সোঁ-সোঁ শব্দ ক'রে উড়ে যাচ্ছে। সুবোধ উপরের দিকে তাকাতেই ওদেরই একটা প্লেন হঠাৎ ডুবুরীর মত মাথাটাকে নীচের দিকে ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উল্কার মত দ্রুতবেগে ঠিক তার দিকেই নেমে আসতে লাগল। সুবোধ চীৎকার করবারও অবসর পেলে না, বোমা না ফেলে গোটা প্লেনটাই যেন লক্ষ বজ্রের নির্ঘোষে তারই মাথার উপর ভেঙে পড়ল।

প্লেন নয়—কেবল কাঁথা আর কম্বল। ভয় পেয়ে চোখ মেলতেই সুবোধ বুঝতে পারলে—শীতে কাঁপতে কাঁপতে কখন কম্বল টেনে গোটা মাথাটাই সে ঢেকে দিয়েছিল, ওরই নীচে নিশ্বাস তার বন্ধ হয়ে আসছে, মাথার মধ্যে যেন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠেছে—ঘামে সারা শরীরটা গিয়েছে ভিজে।

মা গো !—ব'লে সুবোধ কাঁথা আর কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিলে। লম্বা একটা নিশ্বাসে অনেকখানি খোলা হাওয়া ভিতরে টেনে নেবার পর আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করলে সে। কিন্তু তৃষ্ণায় তখন তার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মুখের মধ্যে এক ফোঁটা রসও অবশিষ্ট নেই। অনেক কষ্টে এক বার সে শ্যামাচরণের নাম ধ'রে ডাকলে। কিন্তু ভাল ক'রে তার গলায় আওয়াজই ফুটল না, কেউ সাড়াও দিলে না। বিহ্বল চোখের আচ্ছন্ন দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে সে চেয়ে দেখলে। কিন্তু ঘর খালি, কাউকেই সে দেখতে পেলে না। অস্থির হয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করবার পর আর থাকতে না পেরে নিজেই সে হাতড়ে হাতড়ে খাটিয়ার নীচে থেকে জলের ঘটিটি তুলে নিলে। এক নিশ্বাসে অনেকখানি জল খেয়ে ফেললে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার এমন কাঁপুনি শুরু হ'ল তার যে, হাতের ঘটিটিকে শক্ত ক'রে সে ধ'রেও রাখতে পারলে না। সেটি প'ড়ে গেল মাটিতে ; খানিকটা জল ছিটকে এসে তার

কোঁটায় জল পড়ছে। হাঁ করতেই জিভও ভিজে গেল, তার পর গলা। ঢক্-ঢক্ ক'রে অনেকটা জল খেয়ে ফেললে সে। তার পর সে চোখ মেললে,—চোখের সামনে অবিকল সুভদ্রার মুখ।

নিজের চোখকে সুবোধ বিশ্বাস করতে পারলে না। তার মনে হতে লাগল যে, এও স্বপ্ন, এ ক'দিন কত রকমের স্বপ্নই তো সে দেখেছে! হয়তো স্বপ্নেই চোখ মেলে চেয়েছে সে। বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর আর এক বার আর্তকণ্ঠে 'মা—মাগো' ব'লেই চোখ বুজে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

তার পরেই আবার সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার।

ভোরের দিকে সুবোধের ঘুম ভাঙল। চোখ মেলবার আগেই সে বুঝতে পারলে যে, তার জ্বর ক'মে এসেছে; দেহের সে গ্লানি আর নেই, মনের সে আচ্ছন্ন ভাবটাও কেটে গিয়েছে।

কিন্তু চোখ মেলবার পর তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। ঘরের কোথায় যেন একটা আলো জ্বলছিল, উপরে খড়ের চালের বাঁশের বরগা, এমন কি কালির ঝুল পর্যন্ত সে স্পষ্ট দেখতে পেলে। যে ঘরে দিনের বেলাতেও কোন জিনিসই ভাল দেখা যায় না, সেই ঘরেই শেষরাত্রে আলোর ওই প্রাচুর্য তাকে বিহ্বল ক'রে দিলে। এক বার তার সন্দেহ হ'ল যে, হয়তো সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। কিন্তু চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম; এদিক ওদিক চেয়ে কাউকেই সে দেখতে পেলে না। তার পর পাশ ফিরে দেখলে, অনেক দূরে বেড়ার কাছে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সারদা শুয়ে রয়েছে; তার পাশে তারা, ছোট মেয়ের নেড়া মাথাটা সারদার বুকের কাপড়ের নীচে প্রায় ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। দেখেই মনে মনে সুবোধকে মানতে হ'ল যে, সময়টা সন্ধ্যা বা তার কাছাকাছি কোন সময় নয়। তার বিস্মিত চোখ দুটি তখন ওই অসাধারণ আলোর উৎসটির খোঁজ করতে শুরু ক'রে দিলে। সেটা তখনই তার চোখে পড়ল না; কিন্তু খানিকটা ঘুরেই তার চোখ দুটি যেখানে গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে আর নড়তে পারলে না।

খাটিয়ার খুব কাছেই মাটির উপর একটা মাদুর পেতে তারই উপর সুভদ্রা

শেষ করবার পর সে হাসিমুখে বললে, কালই আপনার রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি আমি, রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু পাওয়া গিয়েছে। আপনি উপেক্ষা ক'রেই রোগটাকে এত বাড়িয়েছেন।

সুবোধ উত্তর না দিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, কখন এলেন আপনি?

সুভদ্রা বিব্রতের মত সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কেন? আগেই তো বলেছি আপনাকে—কাল দুপুরের পর।

শ্যামাচরণদা আপনাকে ডেকে এ:নছে বুঝি?

না।—সুভদ্রা চোখ নামিয়ে উত্তর দিলে, আমি নিজেই এসেছি। *শ্যামাচরণদা আমায় খবর দিয়েছেন মাত্র।*

শ্যামাচরণ কাছেই ছিল, সে হেসে উঠে বললে, আমি আগেই বলেছিলাম, সুবোধবাবু, খবর পেলে দিদিমণি না এসে থাকতেই পারবে না।

থাম তুমি।—সুভদ্রা কুণ্ঠিত চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে ধমক দেবার মত ক'রে বললে, এখানে ব'সে বক্‌বক্ না ক'রে হাসপাতালে একবার যাও—দেখে এস বড় ডাক্তারবাবু এসেছেন কি না!

শ্যামাচরণ বিস্ময়ের স্বরে বললে, কদিনেই সব কথা ভুলে গেলে নাকি দিদিমণি? এত সকালে বড় ডাক্তারবাবু কোন দিন আসেন?

তবু যাও তুমি।—সুভদ্রা যুক্তিটাকে উপেক্ষা ক'রেই রীতিমত হুকুমের স্বরে বললে, ওখানে গিয়েই ব'সে থাক গে; তিনি এলেই আমায় খবর দেবে।

শ্যামাচরণের সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রাও উঠে দাঁড়িয়েছিল; সুবোধ বললে, একটু দাঁড়ান, সুভদ্রা দেবী।

শ্যামাচরণ বের হয়ে যাবার পর সে কুণ্ঠিত স্বরে আবার বললে, আপনি এখানে যে এলেন? ভয় করল না আপনার?

ভয়!—সুভদ্রা সত্যই বিস্মিত হয়ে বললে।

ভয় করবারই তো কথা।—সুবোধ উত্তরে বললে, কেন—শ্যামাচরণদা কিছু বলে নি আপনাকে? আমরা চ'লে যাবার পর এখানে অনেক রকমের কথা হয়েছে যে!

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে বললে, তা আমি জানি। কিন্তু পরের

বিস্ময়ে দুই চোখ বড় ক'রে সুবোধ বললে, দুধ কোথায় পেলেন, সুভদ্রা দেবী ?

সুভদ্রা সংক্ষেপে উত্তর দিলে, বাজারে।

কিন্তু এ যে বড্ড দামী পথ্য !—সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আর তা-ও এতটা ? এ বাড়িতে ওই এতটুকু তারাও তো কোন দিন দুধ খেতে পায় না।

ঠোঁটের কোণের ফুটন্ত হাসিটুকু ছদ্ম গাম্ভীর্যের নীচে চাপা দিয়ে সুভদ্রা বললে, দুধটুকু আগে খেয়ে ফেলুন, বক্তৃতা পরে দেবেন।

তথাপি সুবোধ অবাক চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে সুভদ্রা শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলেই আবার বললে, অনিচ্ছুক লোককে রবারের নলের সাহায্যে কেমন ক'রে দুধ খাওয়ানো যায় তা আমি জানি, সুবোধবাবু—আর সে নল আমার ব্যাগের মধ্যেই আছে।

সুবোধ আর আপত্তি করলে না ; বাটিটা তুলে নিয়ে এক চুমুকেই অর্ধেকটা দুধ সে খেয়ে ফেললে ; তার পর বাটিটা আবার সে থালার উপর নামিয়ে রাখবার উপক্রম করতেই সুভদ্রা উদ্বেগের স্বরে বললে, ও কি—রেখে দিচ্ছেন কেন ?

আর খেতে পারব না, সুভদ্রা দেবী।—বাটিটা নামিয়ে রেখে সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, গায়ে এখনও জ্বর রয়েছে তো—আর বোধ হয় এখন থেকেই বাড়তেও শুরু করছে।

সুভদ্রা আর অনুরোধ করলে না ; সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বাটিটা তুলে নিয়ে সে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

ফিরে এসে ম্লান মুখখানাকে হাসবার মত ক'রে সে বললে, জ্বর এলেও ভাবনার কোন কারণ নেই, ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনাইনের জোরে বন্ধ হবেই।

কিন্তু উত্তরে সুবোধ কাতর স্বরে বললে, আমি বলি কি, সুভদ্রা দেবী, একটু চেষ্টা ক'রে আমায় চুঁচুড়া কি শ্রীরামপুর হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দিন। কত দিন ভুগতে হবে কে জানে !

আপনার শরীরটা সত্যি ভাল নেই।—সুভদ্রা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, আপনার ভাল রকম চিকিৎসা আর যত্নের প্রয়োজন।

তা হয়তো ঠিক।—সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, কিন্তু বাড়িতে গেলে কি লাভ হবে আমার? একবার বাড়িতে যাবার পুরস্কারই তো এই ম্যালেরিয়া!

সুভদ্রা লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তা হ'লে আর কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় যেতে হবে আপনাকে।

সুবোধ হাসতে হাসতেই বললে, কিন্তু সেখানে আমার শুশ্রূষা আর যত্ন কে করবে? সুভদ্রা দেবী দূরে থাক্, শ্যামাচরণদাকেও তো সেখানে পাওয়া যাবে না!

সুভদ্রার কুণ্ঠিত মুখখানিতে এবার একটু লালের ছোপ দেখা দিল। সেটা চোখে পড়তেই সুবোধ তৎক্ষণাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, না, সুভদ্রা দেবী, তেমন কোন শক্ত অসুখ আমার হয় নি। আর হ'লেও এ সময়ে কাজকর্ম ফেলে আমি যেতে পারতাম না।

কাজকর্মের জন্য প্রাণ দেবেন আপনি?—সুভদ্রা মুখ তুলে সোজা সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে করুণ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

কিন্তু সুবোধ হাসিমুখেই উত্তর দিলে, দরকার হ'লে তা-ও দিতে হবে বইকি!

সুভদ্রার চোখ দুটি নত হয়ে পড়ল, সে কোন উত্তর দিলে না।

একটু পরে সুবোধই আবার বললে, না, সুভদ্রা দেবী, শরীরটা আমার একটু কাহিল হয়ে থাকলেও প্রাণ এখনও যাবার নোটিশ দেয় নি। এ বারের জ্বরের ধাক্কা পাঁচ-সাত দিনেই আমি সামলে নিতে পারব।

শুকনো রকমের একটু হাসি হেসে সুভদ্রা বললে, তার পর অত্যাচার-অনিয়ম ক'রে আবার জ্বরে পড়বেন তো?

না।—সুবোধ মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, কথা দিচ্ছি আপনাকে, জ্বরের কথা ঠিক বলতে পারি নে, তবে অত্যাচার-অনিয়ম করব না।

তার পর সুবোধ কাজের কথা বলতে শুরু করলে, নূতন ইউনিয়নের সদস্য কেমন হচ্ছে, পুরানো ইউনিয়নের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কি রকম চলেছে, পুলিসের তৎপরতা কতটা বেড়েছে—এই সব কথা। সুবোধ দুঃখ করলে

হেলেঞ্চার সুক্ত, মাগুর মাছের ঝোল আর কটি কমলালেবুর কোয়া। ভুখারি সুবোধ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল। সিদ্ধ-তরকারিগুলিকে সে কেবল নুন মাখিয়েই খেয়ে ফেললে; একটি চুমুকেই সুক্তের ঝোলটুকু সে শেষ ক'রে দিলে; হেলেঞ্চার ডাঁটা আর পাতাগুলিকে এমন ক'রে চিবোলে যে, ছোবড়ার মধ্যে এক ফোঁটা রসও আর অবশিষ্ট রইল না। তার পর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে একটি গ্রাস মুখে পুরেই আবার সে ছেলে-মানুষের মত উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, চমৎকার হয়েছে, সুভদ্রা দেবী, এমন আর কোন দিন খাই নি।

সুভদ্রা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বললে, আঃ, বড্ড বাড়িয়ে বলছেন আপনি!

কক্ষনো না।—সুবোধ প্রতিবাদ করলে, যা বলেছি তা খাঁটি সত্য কথা। আচ্ছা, বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজেই একটু খেয়ে দেখুন তো!

আঃ!—সুভদ্রা আরও কুণ্ঠিত হয়ে বললে, এমন যদি করেন তো আমি উঠে যাব।

সুবোধ হেসে বললে, তা হ'লে আমি মোটে খাবই না। যান তো উঠে, দেখি কেমন!

সুভদ্রাও হেসে ফেললে; কিন্তু তখনই হাসি থামিয়ে অনুনয়ের স্বরে সে বললে, খান, সুবোধবাবু, শুধু তো আদা আর হলুদের রান্না, জুড়িয়ে গেলে আর মুখে তুলতে পারবেন না।

সুবোধ ভাল ছেলের মত আবার খেতে আরম্ভ করলে; কিন্তু কয়েক গ্রাস খেয়েই আবার মুখ তুলে বললে, সত্যি বলছি, আদার রান্নাই হোক আর গরম মশলার রান্নাই হোক, হয়েছে যেন অমৃত।

ওই, আবার শুরু হ'ল আপনার!—সুভদ্রা আবার লাল হয়ে উঠে বললে।

তোষামোদ নয়, সুভদ্রা দেবী।—সুবোধ হাসিমুখে উত্তর দিলে, সত্যি, জিভে এত ভাল লাগছে যে, মুখ সেটা প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারছে না।

সুভদ্রা লজ্জিত স্বরে বললে, অনেক দিন পরে খাচ্ছেন কিনা, তাই এত ভাল লাগছে।

উহুঁ।—সুবোধ মাথা নেড়ে বললে, কেবল অনেক দিন পরে খাচ্ছি ব'লে নয়, অনেক দিন পরে সুস্বাদু খাবার খাচ্ছি ব'লেই জিভে এত ভাল লাগছে।

না, এবার উঠতেই হ'ল আমাকে।—বলতে বলতে সুভদ্রা সত্যি সত্যিই উঠে দাঁড়াল। সুবোধ চমকে কি একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই সে ভ্রূভঙ্গী ক'রে আবার বললে, দোহাই আপনার, এখন মুখ বুজে ওই ভাত কটা খেয়ে ফেলুন। কিন্তু খাওয়া হ'লেই উঠে পড়বেন না যেন—আমি দুধ আনছি।

খাওয়ার পর মুখ মুছতে মুছতে হঠাৎ তোয়ালেখানি নামিয়ে রেখে সুবোধ জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, আজ সকাল থেকে শ্যামাচরণদাকে দেখতে পাচ্ছি নে কেন?

সুভদ্রা উত্তরে বললে, আমি তাকে কলকাতায় পাঠিয়েছি ক'টা ওষুধ কেনবার জন্য।

ওষুধ!

হ্যাঁ, একটা ইন্জেক্‌শনের আর দুটো খাওয়ার টনিক ওষুধ—ডাঃ চৌধুরী আপনার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। বলেছি তো, এখন কিছু দিন আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

সুবোধ বিহ্বলের মত বললে, কিন্তু আপনি ওষুধ আনতে পাঠালেন কেন?

সুভদ্রা অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, আপনাকে আমার বিশ্বাস হয় না, তাই। চিরদিনই তো দেখে আসছি, নিজের জন্য কোন কিছু কেনবার দরকার হ'লেই আপনার পয়সার অভাব হয়। তাই পয়সার অভাব হ'লেও ওষুধের অভাব যাতে না হয়, তার ব্যবস্থাটা ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।

সুবোধের মুখে আর কোন কথা ফুটল না। একটু পরে সুভদ্রাই আবার বললে, শ্যামাচরণদা এখনই হয়তো ফিরে আসবে। তা ছাড়া ঘরে দু-খানা খবরের কাগজ আছে। তাই নিয়ে একটু সতর্ক হয়ে থাকবেন, দুপুরে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

কথাটার মর্ম ঠিক ঠিক বুঝতে না পেরেই যেন সুবোধ অবাক হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখে সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমায় এখুনি বাইরে যেতে হবে—দুপুরে আমার খাবার নিমন্ত্রণ রয়েছে।

নিমন্ত্রণ!

হ্যাঁ, মিসেস সরকার আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন—ওই যে আমার জায়গায়

সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরেই উত্তর দিলে, এখুনি—খাওয়াটা সেরেই রওনা হব ঠিক করেছি।

সুবোধ বললে, তবে আর দেরি করবেন না—যান, আপনার স্নানও তো হয় নি।

যাবার আগে শ্যামাচরণকে একটা রিক্‌শা আনতে পাঠিয়ে সুভদ্রা সুবোধের কাছে এসে বললে, শরীরের অযত্ন করবেন না, সুবোধবাবু, ওষুধপত্র নিয়ম মত খাবেন। আমায় কথা দিয়েছেন, তা মনে আছে তো?

সুবোধ হেসে বললে, আছে, আর তা থাকবেও। এবারের মত আবার যাতে আপনাকে বিব্রত না হতে হয়, সেই জন্যই এবার আমার অসুখ হওয়াটাকে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু আমার একটা কথা আপনি রাখবেন?

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কি?

সুবোধ হাসিমুখেই উত্তর দিলে, প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে আপনি তো আমায় অষ্টপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছেন। শুধু ওর একটা প্রতিশ্রুতি থেকে আজ আমায় মুক্তি দিয়ে যাবেন?

সুভদ্রা বিহ্বলের মত বললে, কি বলছেন, সুবোধবাবু? কবে আবার কোন্ প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়েছি আমি?

সুবোধ প্রশ্নের উত্তর দিলে না; একটু ইতস্তত ক'রে পরে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আপনার অনুমতি পেলে আপনার বিষয় নিয়ে অরুণাংশুর সঙ্গে আমি এক বার কথা বলতে চাই।

সুভদ্রার মুখখানি অল্প একটু লাল হয়ে উঠেই পরক্ষণেই একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেল। দুই চোখ বড় ক'রে সজোরে মাথা নেড়ে সে বললে, না, সুবোধবাবু—কক্ষনো না; আমার সম্বন্ধে একটি কথাও তাকে আপনি বলতে পাবেন না, আমার ঠিকানাটা পর্যন্ত নয়।

সেই রাত্রির কথা সুবোধের মনে প'ড়ে গেল, তখনও তার এই প্রস্তাব শুনে সুভদ্রা এই রকমেই প্রতিবাদ করেছিল। এ শুধু প্রতিবাদ নয়, এ যেন আর্তনাদ। সুবোধের নিজের মুখখানাও কালো হয়ে গেল।

একটি নিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে; মৃদু স্বরে বললে, বেশ, কথা

অসহ্য গরম। কাপড়ের নীচে দরদর ক'রে ঘাম ছুটছে। কিছুক্ষণ ছটফট করবার পর জামাকাপড় আর গায়ে রাখতে না পেরে সুভদ্রা শেমিজ পর্যন্ত খুলে ফেলে দিলে। তার পর হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল, তা সে জানতেও পারলে না।

তার ঘুম ভাঙল কমলার ডাকে—সুভদ্রা, ও, সুভদ্রা,—কত ঘুমোবে আর? সন্ধ্যে যে হয়!

সুভদ্রা চমকে চোখ মেলেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসল; বুকের কাপড় টেনে দিয়ে লজ্জিত স্বরে বললে, তাই তো, কি ঘুমই ঘুমিয়েছি! ছিঃ ছিঃ, দোরটা পর্যন্ত—

ভয় নেই, আর কেউ দেখে নি।—কমলা তিক্ত কণ্ঠে বললে, উঠে ভাল ক'রে কাপড় সামলাও এখন।

সুভদ্রা উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, যন্ত্রচালিতের মতই বুকের উপর আঁচলখানা সে আরও একটু ক'ষে টেনে দিলে। কিন্তু সে কোন কথা বলবার আগেই কমলা জিজ্ঞাসা করলে, কখন এলে তুমি?

সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, এই দুপুরের পর।

কেন?—কমলার কণ্ঠে কঠিন বিদ্রূপ বেজে উঠল, এলে কেন? নদীতে জল ছিল না ওখানে? ডুবে মরতে পারলে না?

সুভদ্রা হেসে ফেলে বললে, না ভাই, পারলাম না; আর ইচ্ছেও হয় নি।

সঙ্গে সঙ্গেই আলনার উপর থেকে কাপড় জামা আর একখানা তোয়ালে টেনে নিয়ে সে আবার বললে, তবে এখন স্নান করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার, সেটা আগে সেরে আসি। তুমি ততক্ষণে একটু চায়ের ব্যবস্থা যদি কর, প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দেব।

অনেক রকমের পরিহাস আর শক্ত জেরার জন্য তৈরি হয়েই সুভদ্রা স্নানের পর কমলার কাছে এসে বসল। কিন্তু কমলার মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল সে,—সে মুখ অসাধারণ রকমের গম্ভীর। চা খেতে খেতে যে দু-চারটি কথা সে বললে, তা নিতান্তই মামুলী এবং অবান্তর। খাওয়ার পরেও সে রসিকতা করলে না; বরং আগের চেয়েও যেন বেশি গম্ভীর হয়ে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, ঠিক ক'রে বল তো সুভদ্রা, তোমার কি হয়েছে?

দেওয়া অত সোজা নয়। আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তার উপর আজ তোর শরীরের অনেকখানিই আমার চোখে পড়েছে। আজ আর আমার জানতে কিছুই বাকি নেই।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার মাথাটা আবার নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, বার দুই ঢোক গিলে অস্ফুট স্বরে সে বললে, না, কমলা, তুমি ভুল করেছ। আমার কিচ্ছু হয় নি।

কমলা আবার কিছুক্ষণ অভিভূতের মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুভদ্রার একখানি হাত নিজের কোলের উপর টেনে এনে গাঢ় স্বরে সে বললে, সুভদ্রা, লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার কাছে গোপন ক'রো না; সত্যি বল তো, বিয়ে তোমাদের হয়েছে, না, নিজের সর্বনাশ করেছ তুমি?

সুভদ্রার সারা শরীরটাই এক বার থরথর ক'রে কেঁপে উঠল; কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে; একটু দূরে স'রে গিয়ে বললে, কিছুই হয় নি, কমলা, তুমি যা ভেবেছ তা ঠিক নয়। বার বার সব হালকা ঠাট্টা করছ তুমি, এবার তো একেবারে চরম। কেউ শুনতে পেলে কি ভাববে, বল তো!

কমলার চোখ দুটি এক বার যেন জ্ব'লে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে। একটু চুপ ক'রে থেকে একটি নিশ্বাস ফেলে সেও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, আর কোন দিন বলব না। কিন্তু, সুভদ্রা, মনে রেখো, যা আজ আমার চোখে পড়েছে তা আরও দশ জনের চোখে পড়া অসম্ভব নয়,—আর দু-এক মাস পর চোখে তাদের পড়বেই। শত চেষ্টা ক'রেও তোমার এ অবস্থা চির কাল তুমি গোপন রাখতে পারবে না।

সুভদ্রা উত্তর দিলে না। কি উত্তর দিবে সে? ও যে তার নিজের অন্তরের আশঙ্কারই প্রতিধ্বনি! তা-ও অনিশ্চিত আশঙ্কা আর নয়, সুদূরের সম্ভাবনা আজ বর্তমানের রূঢ় বাস্তব হয়ে নিষ্ঠুর আঘাতে তাকে সচেতন ক'রে তুলেছে। আচরণের সতর্কতা আর ক্ষীণ কণ্ঠের অন্তঃসারশূন্য প্রতিবাদের নিরর্থকতার উপলব্ধিই আজ তাকে একেবারে নির্বাক ক'রে দিলে।

কমলা আর তাকে জেরা করলে না; দিন আবার আগের মতই কাটতে

সেদিনের সেই ঘটনার পর সাক্ষাৎভাবে দূরে থাকুক পরোক্ষভাবেও কমলা ওই সম্বন্ধে তাকে আর একটি কথাও বলে নি। কিন্তু দিন-পনরো পর সে দিন দুপুর বেলায় আবার সে সুভদ্রার খুব কাছে ঘেঁষে ব'সে কোন রকম ভূমিকা না ক'রেই জিজ্ঞাসা করলে, একটা আলাদা বাসার খোঁজ করব?

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কেন—বল তো? কিন্তু তার পরেই চমকে উঠে জোরে জোরে মাথা নেড়ে সে আবার বললে, না, না, কিচ্ছু দরকার নেই।

কিন্তু কমলা একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কেবল তোমার জন্য নয়, সুভদ্রা, আমিও সেখানেই থাকব। মেসে থাকতে আমারও আর ভাল লাগছে না।

সুভদ্রা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, না, আমার বাসার দরকার নেই।

কমলা এবার যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, কেন? এখানে এসে অবধিই তো তুমি কেবলই খুঁতখুঁত করছিলে। এখন আবার মেস তোমার এত ভাল লাগল কেন?

ভাল লাগার কথা নয়।—সুভদ্রা মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, কিন্তু বাসা দিয়েই বা আমি কি করব? মানে—কলকাতাই যখন আমি ছেড়ে যেতে চাচ্ছি।

ছেড়ে যেতে চাচ্ছ!—কমলা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে। চোখের দৃষ্টিও তার অকস্মাৎ অসাধারণ রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

সুভদ্রা আগের চেয়েও কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ভাই, এখানে আর ভাল লাগছে না। ভাবছি, আবার পশ্চিমেই ফিরে যাব।

মুখ তুলে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে কথাটাকে সে শেষ করলে, ব্যবসার সুবিধেও তো এখানে তেমন হচ্ছে না, এখানে থেকেই বা কি করব!

কিন্তু যাবে কোথায়?—কমলা বিহ্বলের মত বললে।

সুভদ্রা বার দুই ঢোক গিলে আমতা আমতা ক'রে উত্তর দিলে, আমার আশ্রমেই ফিরে যাব মনে করছি, স্বামীজীকে চিঠিও লিখেছি।

কথাটা মিথ্যা; তথাপি সুভদ্রা ওই কথাটাই সব চেয়ে বেশি জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে।

৪

রমেনবাবু আর মহামায়া দেবীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে অরুণাংশু নিজের বাসায় ফিরবার উপক্রম করেছিল ; কিন্তু প্রতুলবাবু বাধা দিয়ে বললেন, তা হবে না, অরুণ, চল আমার বাড়িতে—রাতের খাওয়াটা আজ আমার ওখানেই সেরে যেতে হবে।

বাড়িতে ফিরবার পর ওই কথাটারই জের টেনে তিনি আবার বললেন, খালি বাড়িতে তোমার হয়তো খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে, বাবা।

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, না, কাকাবাবু, কিছু কষ্ট হবে না। একটা মানুষের জন্য মা তো আধ ডজন লোক রেখে গিয়েছেন।

কথাটা মিথ্যা নয় ; তথাপি প্রতুলবাবু অনুনয় ক'রেই বললেন, আমি বলি কি, অরুণ, কাছাকাছিই যখন বাড়ি তখন খাওয়া-দাওয়াটা তো তুমি এখানেই করতে পার।

অরুণাংশু আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে বললে, না, কাকাবাবু, তার কিছু দরকার নেই, বাসায় আমার কোন অসুবিধে হবে না।

এর পর প্রতুলবাবু আর পীড়াপীড়ি করতে পারলেন না। কিন্তু অরুণাংশুকে একা পেয়েই অনামিকাও একটু যেন অভিমান ক'রেই বললে, বাবার কথাটা সরাসরি অগ্রাহ্য করলে তুমি ? কেন—তিনি মন্দটা কি বলেছিলেন ?

অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, আমি তো বলি নি যে, তিনি মন্দ বলেছেন ? শুধু বলেছি যে, দরকার নেই।

কেন ?—অনামিকা প্রায় উদ্ধত স্বরে বললে, খালি বাড়িতে কষ্ট হবে না তোমার ?

অরুণাংশু মাথা নেড়ে বললে, না, একটুও না। ওঁরা চ'লে যাওয়াতে আমি বরং হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। বাপ—এত দিন ছিলাম যেন জেলখানায়। এবার নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে কাজকর্ম করতে পারব।

আসল কথাটা ওই ভাবে চাপা প'ড়ে গেল। অরুণাংশু তখন দেশের কথা শুরু করলে। ওই প্রসঙ্গে এল রাজনীতি, এল যুদ্ধ, এল তার দলের কার্য-কলাপের কথা। অরুণাংশু নিজে কি কি কাজ শুরু করেছিল অথচ মাঝে

খবর শুনে প্রতুলবাবু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ; তার পর শুধু বললেন, তা বেশ।

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবার পর অরুণাংশু নিজের সফরের সম্পূর্ণ একটা তালিকা অনামিকার হাতে দিয়ে বললে, এটা কেন তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, জান ? যেদিন যেখানে থাকব, সেখানেই তোমার চিঠি যাতে পাই, সেই জন্য। রোজ একখানা—বুঝলে ?

অনামিকা লাল হয়ে উঠে বললে, ব'য়ে গিয়েছে আমার চিঠি লিখতে। ও সব পারব না আমি।

কিন্তু তালিকাটা সে আগাগোড়া মন দিয়ে পড়লে। তার পর কাগজখানা ভাঁজ ক'রে টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রেখে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সে বললে, তুমি যাবে তো পরশু সকালে। কাজেই কালকের দিনটা সব আমায় দিতে হবে।

অরুণাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, কেন, বল তো ?

অনামিকা হাসিমুখেই উত্তর দিলে, দিনের বেলায় 'ক্যাপিটালে'র বাকি অংশটুকু আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে ; আর রাত্রে আমাদের এখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইল !

অরুণাংশুর মুখখানা একবার উজ্জ্বল হয়েই পরক্ষণেই আবার ম্লান হয়ে গেল। মাথা নেড়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, তা তো হবে না, অনু,—কাল যে আমার অনেক কাজ !

অনামিকা কতকটা বিস্মিত, কতকটা আহতের মত বললে, কাল আবার কি কাজ পড়ল তোমার ?

অরুণাংশু বললে, কাল রাত্রে আমাদের পার্টির মীটিং রয়েছে, আর দিনের বেলায় কলকাতায় থাকবই না আমি।

সে কি ! কোথায় যাবে ?

হুগলী।

হুগলী !—অনামিকা চমকে উঠে বললে। চোখ দুটি তার অকস্মাৎ যেন শাণিত তীরের ফলার মতই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অরুণাংশু বোধ করি সেটা লক্ষ্য করলে না, কথার টানেই সে ব'লে চলল,

হ্যাঁ, হুগলী। প্রবীরদা চাপ দিয়েছেন, বাইরে যাবার আগেই ও জায়গাটা এক বার ঘুরে আসতে হবে, অনেক দিন ওখানে যাওয়া হয় নি কিনা!

তার পর অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে আবার বললে, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে; এখন আর বদলানো সম্ভব নয়। নইলে—

থাক্।—অনামিকা বাধা দিয়ে বললে, কিচ্ছু তোমায় বদলাতে হবে না। কিন্তু আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। তা পারবে তো?

অরুণাংশু সবিস্ময়ে বললে, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব? কোথায়?

কেন, হুগলী।

অ্যাঁ!

সত্যি।—অনামিকা মুচকি হেসে উত্তর দিলে, চল না নিয়ে, সুভদ্রা দেবীকে এক বার দেখে চোখ দুটিকে সার্থক ক'রে আসি।

দু-তিন সেকেণ্ড কাল অরুণাংশুর মুখে কোন কথাই ফুটল না; তার পর হঠাৎ সে শব্দ ক'রে হেসে উঠে বললে, ও, সেই কথা! তোমার উপর সুভদ্রা দেবী যে যাদু ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা এখনও কাটে নি দেখছি!

কিন্তু মন্তব্যটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই অনামিকা বললে, সত্যি বলছি, তাঁকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে আমার। নিয়ে যদি যাও, বাবাকে ব'লে রাজী করাব আমি।

অরুণাংশু এবার হাসি থামিয়ে বললে, তোমায় নিয়ে যেতে পারলে আমার তো ষোল আনাই লাভ। কিন্তু যাকে তুমি দেখতে চাচ্ছ, সেই সুভদ্রা দেবী তো ওখানে নেই,—কি করবে গিয়ে?

নেই!—অনামিকা চমকে উঠে বললে, কোথায় গিয়েছেন তিনি?

অরুণাংশু উত্তর দিলে প্রায় মিনিটখানেক পর। অনামিকার দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যমনস্কের মত সে বললে, ঠিক বলতে পারি নে। এলাহাবাদ থেকে আসবার পর তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখাই হয় নি। আমি ফিরবার আগেই উনি ওখানকার চাকরি ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন।

বল কি!—অনামিকা উত্তেজিত স্বরে বললে, এত দিন, কই, এ কথা তো বল নি আমায়!

সুবোধের সঙ্গে তার দেখাও হয়ে গেল। দুপুরে জনসভা ছিল। ইউনিয়নের সভাপতি আর প্রধান বক্তা হিসাবে সভায় খুব জোর গলায় বক্তৃতা দিলে সে; বেশ স্পষ্ট ক'রেই বললে, জাপানকে রুখতে হবে, রুশিয়াকে বাঁচাতে হবে, সমরপ্রচেষ্টায় কোন রকমেই বাধা দেওয়া চলবে না, কারখানার প্রত্যেকটি মজদুর এমনভাবে খাটবে যাতে আগের চেয়ে দ্বিগুণ সব জিনিস তারা উৎপাদন করতে পারে। গান্ধীজীর 'কুইট-ইণ্ডিয়া' ধুয়ার তীব্র সমালোচনা ক'রে আসন্ন সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে মজদুরকে সাবধান ক'রে দিলে সে; সুবোধ আর তার ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মিষ্টি মিষ্টি ক'রে সে অনেক কথাই ব'লে গেল।

সভা ভাঙবার পর ভীড থেকে বাইরে আসতেই সুবোধের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তার পাশে তখন বিমল; সুবোধ একা। অরুণাংশুকে দেখেই সে তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, তোমার বক্তৃতা বেশ মন দিয়েই শুনলাম, অরুণাংশু, কিন্তু এ সব কি বলছ তুমি? আমাকে আর আমার ইউনিয়নকে যত খুশি গাল দাও তুমি। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য জাতি যে সংগ্রামের আয়োজন করছে, তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

সভার উত্তেজনা তখনও মদের নেশার মত অরুণাংশুর মনটাকে মাতিয়ে রেখেছে; সে মুখ লাল ক'রে বললে, সংগ্রাম মাত্রই স্বাধীনতার সংগ্রাম হয় নাকি, সুবোধ?

না, তা হয় না।—সুবোধ অল্প একটু হেসে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, কিন্তু কংগ্রেস যে সংগ্রামের আয়োজন করছে, সে তো স্বাধীনতারই সংগ্রাম!

অরুণাংশু বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, এই—যার মূলমন্ত্র 'কুইট-ইণ্ডিয়া' সেই সংগ্রাম তো?

তথাপি সুবোধ হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলে, মূলমন্ত্রটির বিরুদ্ধেও তোমার আপত্তি আছে নাকি?

আলবৎ আছে।—অরুণাংশু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, এত দিন কোথায় ছিল এ মন্ত্র আর কোথায় ছিলেন এ মন্ত্রের ঋষি? যুদ্ধ যত দিন পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল, জাতি যখন স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আমরা যখন 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' ব'লে তাঁর পায়ে ধ'রে সেধেছিলাম, তখন তাঁর মূলমন্ত্র ছিল ইংরেজকে বিব্রত না করা; আর যেই যুদ্ধের রূপ বদলাল, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ

সুবোধ উত্তর দিলে না। তথাপি একটু চুপ ক'রে থেকে অরুণাংশুই আবার বললে, রাজনীতি থাক্, সুবোধ,—তোমার সঙ্গে অন্য কথা আছে আমার; চল, আর কোথাও যাওয়া যাক।

বিমলের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, তুমি যাও, বিমল, আপিসেই থেকো,—আমি ঘণ্টাখানেক পরে আসছি।

দুজনে একলা হতেই অরুণাংশু আবার সুবোধের হাত চেপে ধ'রে বললে, ব্যাপার কি, সুবোধ? তুমি এখানে একলা কেন? তোমার শরীরও তো শুনছি খুব ভাল নেই।

সুবোধ কুণ্ঠিতভাবে একটু হেসে উত্তর দিলে, শুনেছ ঠিকই। কিন্তু একলা না থেকে আর কি করব—জানই তো,—"বন্ধু যে যত, স্বপ্নের মত, বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ"!—আর, তা ছাড়া, চির কালই তো আমি একলাই থেকেছি।

চির কালের কথা ছাড়।—অরুণাংশু উত্তরে বললে, এখন ঠিক ক'রে বল তো—সুভদ্রা কোথায়?

সুবোধ চমকে উঠল। অরুণাংশুর প্রশ্নের গূঢ় অর্থটা হঠাৎ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই অতীতের সকল কথাও তার মনে প'ড়ে গেল। এমন অভিভূত হয়ে পড়ল সে যে, কিছুক্ষণ মুখে তার কোন কথাই ফুটল না।

কিন্তু তাতেই যেন বেশ একটু কৌতুক অনুভব ক'রে অরুণাংশু সোজা সুজিই জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, সুভদ্রা কোথায়?

এবারও সুবোধ কোন উত্তর দিলে না; দেখে অরুণাংশুই আবার বললে, তাকে দূরে রেখেছ কেন?

এবার সুবোধ হেসে ফেললে,—ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ, কঠিন, হিংস্র সেই হাসি। নিজের হাতখানা অরুণাংশুর মুঠার ভিতর থেকে টেনে নিয়ে সে বললে, তোমার নিজেরই তো ভাল বোঝা উচিত, অরুণাংশু, গোপন মিলনের অমৃত গন্ধই তো সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে এসেছে।

তা জানি।—অরুণাংশু হেসেই উত্তর দিলে; কিন্তু তার পর হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, জানি, ওতে লাভ অনেক; তবে এ কথাও বুঝেছি যে,

সেই আগের মত অদ্ভুত হাসি হেসে সে বললে, থাক্ থাক্, অরুণাংশু, আমার পোড়া ঘায়ে মলম আর লাগাতে হবে না তোমায়। সোজাসুজি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তো,—কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছ ?

উত্তর না দিয়ে অরুণাংশু পাল্টা প্রশ্ন করলে, কথাটা কি তা হ'লে সত্য নয় ?

সুবোধ উত্তর দিলে না ; একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে হঠাৎ অরুণাংশুর কাছ থেকে অনেকটা দূরে স'রে গেল।

অরুণাংশু ব্যাকুল স্বরে বললে, কি সুবোধ, কথা বলছ না কেন ?

সুবোধ এবার বললে, কারণ আমার বলবার কিছু নেই।

অরুণাংশু এগিয়ে গিয়ে সুবোধের হাত চেপে ধরলে ; কাতর স্বরে বললে, আমার মাথা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, সুবোধ ! কথাটা কি তা হ'লে একেবারেই সত্য নয় ? আর না যদি হয়, তবে তোমরা দুজনে হঠাৎ এখান থেকে অমন ক'রে চ'লে গেলে কেন ?

উত্তর দিবার আগে সুবোধ জোর ক' নিজের হাতখানা ছড়িয়ে নিলে ; বললে, তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলতে পারব না, অরুণাংশু।

অরুণাংশু বিহ্বল স্বরে বললে, কেন ?

সুভদ্রা দেবীর নিষেধ আছে।—সুবোধ উত্তরে বললে।

অরুণাংশুর মুখ এবার একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, বেশ, কিছু না বললে তুমি। কিন্তু তার ঠিকানাটা আমায় দাও।

সুবোধ মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, না তা-ও দিতে পারব না।

অরুণাংশু চমকে উঠে বললে, ঠিকানা জান না তুমি ?

সুবোধ মৃদু স্বরে বললে, জানি।

তবে ? তবে সেটা বলতে পারবে না কেন ?

একটু চুপ ক'রে রইল সুবোধ ; তার পর অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে সে বললে, ঠিকানা দিতেও সুভদ্রা দেবীর নিষেধ আছে। তা অমান্য করবার জন্য তুমি আমায় পীড়াপীড়ি ক'রো না। আচ্ছা—বাই বাই !

অরুণাংশু বিহ্বল হয়ে পড়ল। মাস-দুই আগে এই হুগলী থেকেই

কলকাতায় ফিরতে ফিরতে তার মনে হয়েছিল যে, তার বুকের উপর থেকে মস্ত ভারী একটা বোঝা নেমে গিয়েছে। কিন্তু আজ সেই পথ দিয়েই স্টেশনে যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল যে, সেই বোঝাটাই যেন দ্বিগুণ, ভারী হয়ে আবার তার বুকের উপর চেপে বসেছে। বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ জ'মে উঠছিল; সে গাড়িতে গিয়ে বসতেই চেপে জল এল; দিন থাকতেই দিনের আলো গেল নিবে। প্রায়ান্ধকার গাড়ির মধ্যে ব'সে অরুণাংশুর মনে হতে লাগল যে, দুই মাস আগে মুক্তির আনন্দ আর পাওয়ার আশায় যে আলো তার মনের মধ্যে অমন উজ্জ্বল হয়ে জ্ব'লে উঠেছিল, তা আজকের দিনের আলোকের মতই অকালে নিবে গিয়েছে; রূপ আর রসের যে বিচিত্র কল্পলোক সে দিন সকালেও অত সুস্পষ্ট ইশারায় বার বার তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, তা এখন আব একেবারেই চোখে পড়ে না: এমন কি, তার চলার পথটাও হঠাৎ যেন অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হযে গিয়েছে।

রাত্রে পার্টির সভায সে এক রকম বোবা হয়েই ব'সে রইল। তার অন্যমনস্কতা সকলের চোখেই ধরা প'ড়ে গেল। দু-এক জন উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে তার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলে। শরীব ভাল আছে শুনে কমরেড চ্যাটার্জির মত গম্ভীর লোকও টিপ্পনি কেটে বললে, তোমার শরীরের আর সব ভাল থাকলেও স্নায়ুগুলোর অবস্থা ভাল নেই, অরুণাংশু। আমার মতে কোর্টশিপটাকে সংক্ষেপ ক'রে বিয়েটা তোমার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা উচিত।

উত্তরে অরুণাংশু কি যে বললে, তা কেউ শুনতেই পেলে না। আগের মত সহজ ভাবে পরিহাসে যোগ দিতে পারলে না সে।

বাসার কাছে ট্রাম থেকে নেমে প্রতুলবাবুর বাড়ির দিকে সে চেয়ে দেখলে, সে বাড়িতে তখনও অনেক ঘরেই আলো জ্বলছে। কিন্তু সে দিকে একবার পা বাড়িয়েও নিজেকে সামলে নিলে সে।

পরদিনও অনামিকার সঙ্গে দেখা না ক'রেই সে সফরে বের হয়ে গেল। চাকরের কাছে রেখে গেল শুধু অনামিকার নামে দু ছত্রের একখানা চিঠি।

সে দিন সারাটা দিনই অনামিকা উন্মনা হয়ে রইল। কোন কাজেই সে মনোযোগ দিতে পারলে না; থেকে থেকেই তার মনে হতে লাগল যে,

কাছে খালি হয়ে গেল। এ রকম অনুভূতি তার একেবারেই নূতন। কলেজ ছাড়বার পর অধিকাংশ দিনই দুপুরবেলাটা সে খালি বাড়িতে একা একা কাটিয়েছে। দিনের বেলায় ঘুমাবার অভ্যাস তার নেই। রোজই সে হয় বই প'ড়ে, নয় ছবি এঁকে, নয়তো সেলাই নিয়ে এমন মেতে ওঠে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেমন ক'রে যে কেটে যায় সে তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু আগের দিনের মতই সে দিনও দুপুরে কোন কাজেই তার মন বসল না, এক-একটা মিনিট তার মনে হতে লাগল যেন এক একটা ঘণ্টার মত দীর্ঘ।

বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে সে দিন সে ঘুমাবার চেষ্টা করলে। অনুকূল অবস্থার অভাব যে ছিল, তা নয়। রাজপথের কোলাহল তখন বন্ধ; যেটুকু আছে তারও ঘরে আসবার পথ নেই। বাড়িখানি নিস্তব্ধ, নিঝুম। মাথার উপর হু-হু ক'রে পাখা চলছে, তার একটানা আওয়াজে ঘুমপাড়ানী গানের সুর।

তথাপি অনামিকার চোখে ঘুম এল না। অরুণাংশুর কথাই বার বার তার মনে উঠতে লাগল; কোথায় এখন সে আছে, কি করছে, এই সব চিন্তা আর কল্পনা। ঘণ্টাখানেক ছটফট করবার পর বিছানা ছেড়ে উঠে অরুণাংশুর দেওয়া সেই সফরের তালিকাটাকে সে খুঁজে বের করলে; আর সঙ্গে সঙ্গে তার দু-ছত্রের সেই চিঠিখানাও। দুখানা কাগজই হাতে নিয়ে সে তার লেখবার টেবিলের ধারে গিয়ে বসল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই নীচে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। আওয়াজটা তাদেরই বাড়ির গাড়ির আওয়াজের মত। অনামিকা চমকে দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল, সবে তখন তিনটা বেজেছে। এত সকালে তাদের গাড়ি কেন বাড়িতে ফিরে আসবে তা সে বুঝতে পারলে না। ভাবলে, শুনতে তার ভুল হয়েছে। কিন্তু তখনই আবার শব্দ শোনা গেল, এবার গাড়ি থামবার শব্দ। অনামিকা বিস্মিত হয়ে জানালার কাছে গিয়ে নীচের দিকে তাকাল।

ঠিক তাদের গাড়ি, দাঁড়িয়েছে গাড়িবারান্দার নীচে; দরজা খোলা, পাশেই জন তিনেক লোক, এক জন তার চেনা, তার বাপেরই এক উকিল বন্ধু। অনামিকা তার নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলে না, ওই কজন

তার পর গম্ভীর স্বরে তিনি আবার বললেন, রোগটা তো তোমার বাবার নতুন নয়, তবে এবারের আক্রমণের জোরটা হয়েছে বেশি। তা হ'লেও চিকিৎসার চেয়েও রোগীর শুশ্রূষার প্রয়োজনই বেশি। কিন্তু সেটা তো একা তোমার দ্বারা হবে না, মা।

সে কি, জ্যেঠামশায়!—অনামিকা বিস্মিত, ঈষৎ যেন বিরক্ত হয়েই বললে, বাবার শুশ্রূষা চির কালই তো আমিই ক'রে এসেছি।

ডাক্তার বোস অল্প একটু হেসে বললেন, এবারের আক্রমণটা একটু অন্য রকমের; ব্যবস্থাটাও সেই জন্য অন্য রকমের হওয়া দরকার। আমার স্ত্রীকে আমি বরং এখনই আসতে ব'লে দিচ্ছি। আর তা ছাড়াও— বলতে বলতে চুপ ক'রে গেলেন তিনি; একটু পরে হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, আচ্ছা, অনু, একটি ভাল শিক্ষিতা নার্স যদি ডেকে দিই, তোমার আপত্তি আছে কিছু?

অনামিকা উৎফুল্ল হয়ে বললে, তা কেন থাকবে, জ্যেঠামশায়? সে তো খুব ভাল হবে।

আচ্ছা, দেখছি ফোন ক'রে।—ডাক্তার বোস উত্তরে বললেন, তুমি এখন ও ঘরে যাও। কিন্তু সাবধান, কান্নাকাটি ক'রো না যেন।

আধ ঘণ্টাখানেক পর আবার তিনি অনামিকাকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললেন, নার্স একটি পেয়েছি, অনু; বেশ ভাল মেয়েই পেয়েছি; দেখলেই তোমায় মানতে হবে, একেবারে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। তবে বাইরে মেয়েটি একটু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির; তার জন্য আলাদা একটি ঘর আর আলাদা স্নানের ঘর চাই, নইলে কিছুতেই সে দিনরাত এখানে থাকতে রাজি হচ্ছিল না। তা কথা আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি, তোমাদের বাড়িতে তো ও-সবের অভাব নেই, তুমি ঝিকে একটা ঘর ঠিক করতে ব'লে দাও। সেও বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে যাবে।

সুভদ্রা এসেছিল সন্ধ্যার একটু আগে। পরিচয়ের সময়ে ডাক্তার বোসের মুখে তার নাম শুনেই অনামিকা চমকে উঠেছিল। কিন্তু তখনও প্রতুলবাবুর জ্ঞান হয় নি, এক তাঁর কথা ছাড়া অন্য কোন কথা ভাববার সময় অনামিকার ছিল না, কোন রকম অনুসন্ধান করবার সময় বা প্রবৃত্তি তো মোটেই নয়।

থাকতে না পেরে অনামিকা ব'লেই ফেললে, কি চমৎকার, সুভদ্রা দেবী! আমি তো এমন পারি নে!

সুভদ্রা প্রথমে চমকে উঠল; কিন্তু পরে লজ্জিতভাবে মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আপনার পারবার কথাও তো নয়, আমি যে অনেক দিন ধ'রে এ কাজ শিখেছি।

অনামিকা ক্ষোভের স্বরে বললে, আমারও এ কাজ শেখা উচিত ছিল। কি কোমল আপনার হাত, আর কি সুষ্ঠু আপনার কাজ!

কি যে বলেন, ও তো কেবল অভ্যাস!—সুভদ্রা আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে বললে।

একটু চুপ ক'রে থেকে নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে অনামিকা আবার বললে, আমি বাবার কিছুই করতে পারলাম না। বুকে একটু মালিশ করা, তা-ও আমি পারি নে, হাত কেঁপে যায়, বাবার লাগে। অথচ আমি তার মেয়ে।

সুভদ্রা সান্ত্বনার স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, আপনি মেয়ে ব'লেই পারেন না, আপনার মনটা বড্ড উতলা হয়েছে কিনা—তাই হাত আপনার কেঁপে যায়। আমি কাজ করি চলতি একটা যন্ত্রের মত, আমার তো মনের বালাই নেই!

না, সুভদ্রা দেবী।—অনামিকা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, ও কথা আমি বিশ্বাস করি নে। দরদ না থাকলে কেউ কি আপনার মত এমন কাজ করতে পারে!

কি যে বলেন!—ব'লে সুভদ্রা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সেই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে যে প্রশ্নটা অনামিকার মনে জেগে উঠেছিল, সেটাই আবার মাথা তুলে খাড়া হয়ে উঠল, এই কি সেই সুভদ্রা দেবী?

এ দুদিন প্রায়ই এই প্রশ্নটা তার মনে উঠেছে, কিন্তু সংশয় দূর হয় নি। কল্পনার তুলি দিয়ে সুভদ্রার যে মূর্তি সে তার মনের পটে এঁকে রেখেছিল, তার সঙ্গে রক্তমাংসের এই সুভদ্রার যেন মিল নেই, অসাধারণ হ'লেও এ মেয়েটি অত অনন্যসাধারণ যেন নয় যাতে অরুণাংশুর মত পুরুষকে সে জয় করতে পারে। এ মেয়েটির রূপ নেই। এর রঙ কালো, গঠন শ্রীহীন,—একে কুৎসিত বললেও যেন এর নিন্দা করা হয় না। অথচ নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে এ যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন। এ কাপড় পরে ঘাঘরা

আরও যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সুভদ্রার একখানা হাত নিজের কোলের উপর টেনে এনে ব্যাকুল স্বরে তিনি আবার বললেন, তোমার মা-বাপ নেই? এ যে— তা আমায় সব কথা খুলে বল তো, মা, পর মনে ক'রো না আমায়। ওঁরা কত দিন গত হয়েছেন?

প্রতুলবাবুর মুঠার মধ্যে সুভদ্রার হাতখানি কেঁপে উঠল। সেটা অনুভব ক'রে প্রতুলবাবু আবার বললেন, বল, মা, তোমার মাকে কবে হারিয়েছ তুমি?

সুভদ্রা অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলে, মাকে আমি দেখি নি। শুনেছি যে, আমাকে জন্ম দিয়েই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

কি সর্বনাশ! আর তোমার বাবা?

তাঁকেও আমার মনে নেই, তিনি মারা যান যখন আমার বয়স চার-পাঁচ বছর।

তার পর?

তার পর প্রতিবেশীরা আমায় আর্য সমাজের এক আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেই আমি মানুষ হয়েছি।

এর পর কিছুক্ষণ প্রতুলবাবুর মুখে আর যেন কোন কথাই ফুটল না। কিন্তু কুণ্ঠিতা সুভদ্রা আলগোছে তার নিজের হাতখানা টেনে নিতেই তিনি সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠে আবার বললেন, কিন্তু তোমার বিয়ে? ।বয়েও তো তোমার হয় নি মনে হচ্ছে।

এবার সুভদ্রা আর মুখে কোন উত্তর দিলে না, শুধু মাথাটা একটু নেড়েই সে বুঝিয়ে দিলে যে, বিয়ে তার হয় নি। তার পরেই উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, আমি আসছি।—ব'লেই তৎক্ষণাৎ সে বের হয়ে গেল।

অনামিকা এতক্ষণ যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুভদ্রা চ'লে যেতেই সে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ভর্ৎসনার স্বরে বললে, তোমার কি একেবারেই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাবা?

প্রতুলবাবু বিব্রত ভাবে বললেন, কেন মা?

ছিঃ ছিঃ!—অনামিকা ভুরু কুঁচকে বললে, অজানা, অচেনা ভদ্রমহিলা, আমাদের সঙ্গে দুদিনের মাত্র পরিচয়। অথচ তারই ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তুমি কিনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে!

তিরস্কারটা প্রতুলবাবু গায়েই মাখলেন না। গভীর সমবেদনার স্বরে তিনি বললেন, আহা, মেয়েটি বড় দুঃখী!

হোক দুঃখী।—অনামিকা ঝাঁজের স্বরে উত্তর দিলে, দুঃখী ব'লেই তো তার দুঃখের কথা নিয়ে তাকে জেরা করা তোমার উচিত হয় নি। ছিঃ ছিঃ! ভদ্রমহিলা তাঁর দুঃখের মধ্যেও কি লজ্জাই না আজ পেয়েছেন!

প্রতুলবাবু এবার অপরাধীর মত মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, আচ্ছা, মা, আর বলব না। তুমি যাও তো, তাকে ডেকে নিয়ে এস।

পরের দিন ডাক্তার বোস এলেন দুপুরের পর। রোগীকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করবার পর হাসিমুখে বললেন, যাক্, তুমি সেরে উঠেছ, প্রতুল। দু-চার দিনের মধ্যেই হাঁটা-চলা করতে পারবে আশা করি।

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।—প্রতুলবাবুও হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, শুয়ে শুয়ে গায়ে আমার ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

তার পর সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, শুনলে তো ডাক্তারের কথা? এবার আমায় তুলে বসিয়ে দাও তো, সমেরুদণ্ডীর মত চারদিকটা এক বার তাকিয়ে দেখি।

পর পর কয়েকটি বালিশ সাজিয়ে নিরাপদ একটা দুর্গের মত ক'রে ওরই মাঝখানে প্রতুলবাবুকে বসিয়ে দিলে সুভদ্রা। তার পর ডাক্তার বোসের কাছে গিয়ে সে বললে, সার্, আমি ফিরে যেতে চাই।

কথাটা কানে যেতেই প্রতুলবাবু চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, কি বলছ, সুভদ্রা?

সুভদ্রা তার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আমি আজ যেতে চাই মিঃ গুপ্ত, আপনার শরীর তো এখন বেশ ভাল হয়ে গিয়েছে।

অসম্ভব! প্রতুলবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, কে বললে ভাল হয়ে গিয়েছে?—কি হে ডাক্তার, ও অনু, সুভদ্রা বলে কি? আমার শরীর নাকি ভাল হয়ে গিয়েছে?

অনামিকা হাসিমুখে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, বাবা, আজ তোমার মুখের দিকে চাইলে তোমায় রোগী ব'লে আর মনেই হয় না।

অনামিকা এবার আর প্রতিবাদ করলে না বটে, কিন্তু তার মুখখানি সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠল। স্মিত মুখে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে শীগগিরই হবে বুঝি ?

'হবে' কি বলছ !—প্রতুলবাবু উত্তরে বললেন, বল 'হয়েই গিয়েছে'। সব ঠিক, কেবল দিনক্ষণের গোলমালের জন্যই যা দেরি।

একটু থেমে, এক বার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তিনি আবার বললেন, তাই তো বলি, মেয়ে আমার পর হয়ে যাবে। আর যাবে কি বলছি, পর হয়েই গিয়েছে। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, ওর মনের মধ্যে আমার স্থান আর নেই, সবটুকু জায়গাই অধিকার ক'রে নিয়েছে সেই আমার ভাবী বাবাজীবন।

আঃ, বাবা !—অনামিকা মুখ তুলে বললে ; ব'লেই আবার মুখ নামিয়ে নিলে সে।

হাসি-ভরা চোখে সুভদ্রা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতুলবাবুকে উদ্দেশ ক'রে বললে, না, মিঃ গুপ্ত, তা কখনও হয় না। মেয়ে কি বাপকে কখনও ভুলতে পারে !

নিশ্চয়ই পারে।—প্রতুলবাবু যেন প্রতিবাদ ক'রে বললেন, অন্তত এক জন যে পেরেছে, সে তো আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাত বাড়িয়ে অনামিকাকে জড়িয়ে ধরলেন ; তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে আবার হাসিমুখে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে পরিহাসের স্বরে তিনি বললেন, শোন তবে, তোমায় বলছি। বাবাজী আমার উৎকট কম্যুনিস্ট, দিনরাত প্রলেটারিয়েট নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে বেড়াচ্ছেন, সব রকমেই সে আমার উল্টো। অথচ আমারই ঘরে, আমারই স্নেহে, আমারই এই প্রতিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেও অন্নু বিয়ের আগেই সেই দিগম্বর সন্ন্যাসীর উপযুক্ত সহধর্মিনী হবার জন্য উমার মত তপস্যা শুরু ক'রে দিয়েছে,—খাওয়া কমিয়েছে, গায়ের গয়না বাক্সে বন্ধ করেছে, ভাল কাপড়-খানা পর্যন্ত পরা ছেড়ে দিয়েছে। কেমন ?—কথাটা প্রতুলবাবু অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে শেষ করলেন, ঠিক বলছি নে ?

যাও।—ব'লে অনামিকা বাপের বাহুর পিছনে মুখ লুকিয়ে ফেললে।

অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা এবার হেসেই ফেললে ; কিন্তু তখনই আবার হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, আপনি বসুন, আমি দুধ নিয়ে আসি গে।

কিন্তু সুভদ্রা দোর পর্যন্ত যাবার আগেই সশব্দে কবাট খুলে গেল। ঝড়ের মত ঘরে এসে ঢুকল অরুণাংশু।

প্রতুলবাবু উৎফুল্ল স্বরে বললেন, এই যে অরুণ!

কিন্তু তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই সুভদ্রার সঙ্গে অরুণাংশুর চোখাচোখি হয়ে গেল। প্রায় এক সঙ্গেই দুজনেই এক এক পা পিছনে স'রে গেল ; তার পর আবার এক সঙ্গেই দুজনেই যেন পাথর হয়ে গেল।

সাদর সম্ভাষণের যে কথাটা প্রতুলবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর তাঁর মুখে ফুটল না। অরুণাংশুর শক্ত বিবর্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়েই তিনি উদ্বেগের স্বরে বললেন, এ কি অরুণ, কি হ'ল তোমার? কোনও অসুখ করল নাকি? আর সুভদ্রা, তোমার আবার কি হ'ল? ও অনু, এ কি ব্যাপার! কি হ'ল এদের?

অনামিকা উত্তর দিলে না ; সুভদ্রাও পাথরের মূর্তির মতই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল অরুণাংশুর অসাড় দেহটাই অকস্মাৎ যেন ভূমিকম্পের তাড়নায় থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। সুভদ্রার মুখের উপর থেকে নিজের বিহ্বল চোখ দুটিকে সরিয়ে নিয়ে সে প্রথমে অনামিকার ও পরে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে তাকাল ; খাটের দিকে দু'পা এগিয়েও গেল সে ; কিন্তু তখনই হুমড়ি খেয়ে পড়বার মত থেমে গিয়ে ডান হাতে কপালের উপরের চুলগুলিকে পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে অস্ফুট স্বরে থেমে থেমে সে বললে, আপনারা বসুন, আমি এই এলাম কিনা, একটু পরে আবার আসছি—

কথা শেষ হতে না হতেই মুখ ফিরিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে সে বের হয়ে গেল।

কি ব্যাপার এ সব! প্রতুলবাবু উদ্‌ভ্রান্তের মত চীৎকার ক'রে উঠলেন, ও অরুণ, কোথায় যাচ্ছ তুমি? আহা—কথাটা— ও সুভদ্রা—তোমার আবার কি হ'ল, সুভদ্রা?

প্রতুলবাবু দু-তিন বার সুভদ্রাকে ডাকবার পর তবে যেন তার চৈতন্য

সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসে এক হাতে বাপের গলা জড়িয়ে ধ'রে আর এক হাতে তাঁর মুখে ও বুকে হাত বুলাতে বুলাতে সে আবার বললে, তুমি শান্ত হও, বাবা। কই, কিছুই তো হয় নি! শোও তুমি, ভাল হয়ে শোও দেখি!

কিন্তু—। প্রতুলবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ওরা অমন ভাবে চ'লে গেল কেন? ডাক না একবার সুভদ্রাকে, ওরা কি—

তুমি আগে শান্ত হও তো, বাবা।—অনামিকা এবার বাপের মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বললে, তোমার যে অসুখ শরীর। আমি বলছি, ভয়ঙ্কর কিছু হয় নি। যা হয়েছে, তা আমি বুঝতে পেরেছি।

অ্যাঁ, বুঝতে পেরেছ তুমি? কি বুঝেছ? ওরা পরস্পরের চেনা-জানা নাকি?

বোধ হয় তাই।

অ্যাঁ!—কেমন ক'রে জানলে তুমি? সুভদ্রা তোমায় কিছু বলেছে নাকি?

না, বাবা।

তবে?

অনামিকা এবার চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, তুমি আগে শান্ত হয়ে শোও, বাবা; আমি পরে তোমায় বলছি।

না, না।—প্রতুলবাবু অসহিষ্ণুর মত বাধা দিয়ে বললেন, পরে নয়, এক্ষুনি বল। কি জান তুমি? কার সম্বন্ধে কি জান তুমি? কার কাছে জেনেছ? না শুনলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব আমি।

বাবা!—অনামিকা আবার তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বললে, এমন ছেলেমানুষি কেন করছ তুমি? তুমি শোও আগে, তার পর বলছি।

প্রতুলবাবু পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু আগের মতই অসহিষ্ণু স্বরে তিনি বললেন, না, অনু, আগে তুমি আমায় বল। কি জান তুমি? কার কাছে কি শুনেছ?

প্রতুলবাবুর ভাব দেখে অনামিকা কথাটা আর গোপন করতে সাহস পেলে না। কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে সে বললে, উনিই আমায় বলেছেন।

প্রতুলবাবু চমকে উঠে বললেন, কে বলেছে—অরুণাংশু?

হ্যাঁ, বাবা।

থাকতেন, এক সঙ্গে দেশের কাজ করতেন। ওঁদের পরস্পরের পরিচয় ছিল, ভাবও হয়েছিল। এ সব কথা উনিই আমায় বলেছেন। তার পর উনি ওখান থেকে চ'লে আসবার পর সুভদ্রা দেবী নাকি ওখান থেকে চ'লে গিয়ে বিয়ে করেছেন।

অ্যাঁ!—প্রতুলবাবু আবার দুই চোখ বড় ক'রে বললেন, এ কথা আবার কে বললে?

এ কথাও উনিই আমায় বলেছেন।

কিন্তু সুভদ্রা যে বললে যে, তার বিয়ে হয় নি!

অনামিকা চমকে তার বাপের মুখের দিকে তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিলে। এবার আর তার মুখে উত্তর ফুটল না।

প্রতুলবাবু কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে ব'লে উঠলেন, না, না, এ তো ভাল কথা নয়, নিশ্চয়ই নয়। কিছু একটা গলদ এর মধ্যে আছেই। নইলে অমন চোরের মত—

কথাটা তাঁর শেষ হ'ল না; হঠাৎ তাঁর চোখ দুটি আগুনের মত জ্ব'লে উঠল; মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রুক্ষ স্বরে তিনি বললেন, এ সব কথা জেনেও এত দিন আমার কাছ থেকে তুমি লুকিয়ে রেখেছ কেন, অনু? কেন—কেন এ সব কথা আমায় খুলে বল নি?

অনামিকা আহতের মত মুখ তুলে বললে, বলবার তো কোনও উপলক্ষ হয় নি বাবা! আর, তা ছাড়া ব্যাপারটা তেমন গুরুতর কিছুও তো নয়!

গুরুতর নয়!—প্রতুলবাবু প্রায় চীৎকার ক'রে বললেন, এমন একটা ব্যাপারকে তুমি গুরুতর মনে কর না অনু? দিন দিন কি হচ্ছ তুমি?

কিন্তু তার পরেই অবসন্নের মত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি; সুর বদলে আবার বললেন, না, তোমাকে দোষ দিয়ে আর কি হবে! চোখ থাকতেও আমি নিজেই যখন অন্ধ হয়ে ছিলাম!

অনামিকা কোন উত্তর দিলে না; নত মুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার দুধটা আমি নিয়ে আসি বাবা, দুধ খাবার সময় অনেকক্ষণ তো পার হয়ে গিয়েছে।

নির্দোষ নয়। চোখের সামনে আজকের এই নাটক দেখবার পর কিছুতেই ওর হাতে তোমায় আমি সম্প্রদান করব না।

একটু থেমে আরও একটু চড়া সুরে তিনি আবার বললেন, না, কক্ষনো না, বিয়ে আমি কিছুতেই দেব না। কুক্ষণে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু এবার সব সম্বন্ধই আমি চুকিয়ে দেব। 'তারে'র ফর্ম নিয়ে এস, অনু, রমেনদাকে এক্ষুনি আমি 'তার' করব। যাও—ফর্ম নিয়ে এস শীগগির।

কিন্তু অনামিকার ঠোঁট দুখানা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল; খাটের কোণটা আরও জোরে চেপে ধ'রে সে বললে, বিয়ে তুমি ভেঙে দেবে, বাবা?—আশীর্বাদের পর?

হোক আশীর্বাদের পর।—প্রতুলবাবু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন, এ বিয়ে নিশ্চয়ই ভেঙে দেব আমি। একটা অনুষ্ঠান বা একটা মুখের কথার চেয়ে মানুষের জীবনের দাম ঢের বেশি।

কিন্তু, বাবা,—। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে অনামিকার গলার স্বর কেঁপে উঠল; থেমে থেমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কথাটাকে সে শেষ করলে, আমি—আমি যে তাকে ভাল—বাসি!

প্রথমে প্রতুলবাবু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু তার পরেই বারুদের মত জ্ব'লে উঠে তিনি বললেন, ভালবাস—ওই স্কাউণ্ড্রেলটাকে ভালবাস তুমি? ভুলিয়ে-ভালিয়ে যে তোমার সর্বনাশ করবার উপক্রম করেছিল সেই চরিত্রহীন লম্পটটাকে ভালবাস তুমি?

উত্তরে কি একটা কথা বলবার উপক্রম করলে অনামিকা; কিন্তু অস্ফুট একটা আওয়াজ ছাড়া কিছুই তার কণ্ঠে ফুটল না। কিন্তু তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই প্রতুলবাবুই আবার বললেন, কিন্তু ঠিক জেনো, অনু, ওই অরুণের হাতে আমি তোমায় কিছুতেই সম্প্রদান করব না। আমার অমতেও ওকেই যদি বিয়ে তুমি করতেই চাও তবে তার আগে আমার কাছ থেকে তোমায় বিদায় নিয়ে যেতে হবে; আর পরে আমার ধনসম্পত্তি যদিও বা তুমি পাও, আমার আশীর্বাদ তুমি কিছুতেই পাবে না। আমার অভিসম্পাত মাথায় নিয়েই তোমার আর তোমাদের সন্তানসন্ততিদের জীবন কাটাতে হবে।

বাবা!

রেলিং ধ'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে; তার পর একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে মেসে ফিরে গেল।

সেই হুগলী যাবার আগে সুবোধের নাম আর ঠিকানা লেখা যে কাগজখানি সুভদ্রা তার হাতে দিয়ে গিয়েছিল, সেখানা কমলা আজ খুঁজে বের করলে। দারোয়ানকে ডেকে সেই কাগজখানাই তার হাতে দিয়ে সে বললে, এক্ষুনি তোকে হুগলী যেতে হবে। এই ঠিকানায় গিয়ে এই বাবুটিকে বলবি যে, সুভদ্রা দেবীর খুব অসুখ, একটুও দেরি না ক'রে তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবি। এখানে যদি আমায় না পাস তো তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবি। খুঁজে বের করবি, আমরা কোথায় আছি; তার পর বাবুকে সেখানে নিয়ে যাবি। পারবি নে?

দারোয়ান মুখ ম্লান ক'রে বললে, শকেঙ্গে তো জরুর; লেকিন লৌটনে বকত গাড়ি কহাঁ মিলেগী?

কমলা উত্তরে ধমক দিয়ে বললে, রাস্তায় গাঁজা খেতে না বসলে গাড়ি তুই আলবৎ পাবি। আর না'ও যদি পাস, স্টেশনে রাত কাটিয়ে ভোরের গাড়িতে আসবি। বাবুকে বলবি, সুভদ্রাদিদিমণি বাঁচে কি না তার ঠিক নেই। না আসতে চাইলে গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনবি। তবে, হ্যাঁ, আর কাউকে সঙ্গে আনবি নে যেন—কোন চাকর-বাকরও নয়।

দারোয়ানকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে কমলা হাসপাতালে ফিরে গেল। এবার ডাক্তার আশার কথা বললেন, জ্ঞান না হ'লেও রক্ত বন্ধ হয়েছে। সঙ্কটটাও বোধ হয় দুজনেরই কেটে গিয়েছে।

কমলা ছুটে গেল কেবিনের ব্যবস্থা করতে। কুলি-মেথরদের মোটা বকশিশ দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে আবার যখন সে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ফিরে এল, তখন সুভদ্রার জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু কমলাকে দেখে সে কথা বলবার চেষ্টা করতেই কমলা হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধ'রে বললে, এখন কোন কথা নয়, শুভা,—এখন কেবল ঘুম। চুপটি ক'রে সারাটা রাত তোমায় ঘুমোতে হবে। কেবিন আমি ঠিক করেছি, একটুও গোলমাল হবে না।

সুভদ্রাকে ঘুম পাড়িয়ে কমলা অবশিষ্ট রাতটুকু তার বিছানার পাশে জেগে ব'সে রইল।

সুভদ্রা কোন উত্তর দিলে না। একটু চুপ ক'রে থাকবার পর কমলাই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বোস তুমি,—তোমার মুখ ধোবার ব্যবস্থা করি।

কমলাই জল নিয়ে এল। সুভদ্রাকে তুলে বসিয়ে দিলে সে। তারই হাত থেকে দুধের বাটি হাতে নিয়ে সুভদ্রা ধৃষ্টিতের মত একটু হেসে বললে, কাল নিজে আমি এই রকমেই আর এক জনের সেবা করছিলাম। তখন ভাবতেও পারি নি যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অসহায় হয়ে আমাকেই আর এক জনের সেবা নিতে হবে।

কমলাও হেসে ফেলে বললে, কাল সন্ধ্যার আগে আমিও কি ভাবতে পেরেছিলাম যে, বিনি-পয়সার এমন একটি রোগী আমার ঘাড়ে এসে পড়বে!

কিন্তু তার পরেই হাসি থামিয়ে উদ্বেগের স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটল কেমন ক'রে? সব কথা খুলে বল তো, কিছুই তো শোনা হয় নি এখনও!

কোন কথাই আমার মনে নেই।—সুভদ্রা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, ট্যাক্সি ক'রে মেসে ফিরছিলাম, হঠাৎ জোরে একটা ধাক্কা লাগল। তার পর কি যে হ'ল, কিছুই জানি নে আমি!

কমলা একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, যাক্, অল্পের উপর দিয়েই ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। অত বড় একটা দুর্ঘটনার পরেও দুজনেই যে তোমরা বেঁচে গিয়েছ, সে কেবল ভগবানের দয়ায়।

কিন্তু এই কথাটা কানে যেতেই সুভদ্রার বিবর্ণ মুখের উপর একটা লালের ছোপ ফুটে উঠেই তৎক্ষণাৎ আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিলে সে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, মেসের সবাই সব কথা জানতে পেরেছে নাকি?

কমলার মুখখানা দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল; নিজেও চোখ নামিয়ে সে উত্তর দিলে, জানবে না? এর পরেও এ কথা গোপন থাকতে পারে নাকি?

কিন্তু তার পরেই যেন মেঘের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে বিদ্যুৎ ফুটে উঠল। মুখ তুলে, ভুরু বেঁকিয়ে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কমলা আবার বললে, কেন লো, পোড়ারমুখী, এখন এত ভাবনা কেন? এখন বলতে পারিস নে যে, তোর

কিন্তু আমি যে শুনলাম—

ওমা—কি শুনলেন আপনি? কার কাছে শুনলেন? কে খবর দিলে আপনাকে?

আমি খবর দিয়েছি।

এবার কথা বললে কমলা। সুবোধ আর সুভদ্রা দুজনেই চমকে এক সঙ্গে কমলার মুখের দিকে তাকাতেই মাথাটা একটু ঝেঁকে সে আবার বললে, হ্যাঁ, আমিই খবর দিয়েছি। কেন খবর দিয়েছি, তা বুঝতে পারেন নি আপনি?

প্রশ্নটা সে সুবোধের মুখের দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল, সুবোধ বুঝতে না পেরে বিহ্বলের মত বললে, কই, না তো।

কই, না তো!—বলতে বলতে কমলার চোখ দুটি যেন জ্ব'লে উঠল—বড্ড যে ভালমানুষ সাজা হচ্ছে এখন! কিন্তু আজ আর ওতে চলবে না। মনে রাখবেন, শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছেন এবার।

সুবোধের চেয়েও যেন বেশি বিস্মিত হয়ে সুভদ্রা বললে, ও কমলা, এ কি বলছ তুমি?

তুই থাম্।—কমলা সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে ধমক দিয়ে বললে, কোন কথা তোকে বলতে হবে না। যা করবার তা আমিই করছি।

পরক্ষণেই সুবোধের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে আবার বললে, চুপ ক'রে রইলেন যে? সুভদ্রার গর্ভে সন্তান আছে, এ কথা জানেন না আপনি?

সুভদ্রা সবেগে মাথা নেড়ে বললে, না।

তথাপি কমলা সুবোধকেই ধমক দিয়ে বললে, বলুন, জানেন কি না?

সুবোধ সম্মোহিতের মত উত্তর দিলে, জানি।

কমলা বললে, সে সন্তান আপনার। বলুন, সত্যি।ক না?

না, না।—সুভদ্রা এবার পাগলের মত দুই হাত উঁচু ক'রে আর্তনাদ ক'রে উঠল, না, কমলা, কক্ষনো নয়। ছিঃ ছিঃ, চুপ কর, কিচ্ছু জান না তুমি, কাকে কি বলছ?

সুবোধের শরীরটা আগেই যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল, কি একটা কথা বলবার উপক্রম ক'রেও কোন কথাই সে উচ্চারণ করতে পারে নি। তার উপর সুভদ্রার আর্ত কণ্ঠের ওই সুস্পষ্ট প্রতিবাদ শুনে কমলা কেমন যেন বিহ্বল

সে। চট্ ক'রে চোখ মুছে সে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে কোমল মৃদু স্বরে ডাকলে, সুভদ্রা দেবী!

সুভদ্রা চমকে মুখ তুলে তাকিয়েই ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। কিন্তু সে কোন কথা বলবার আগেই সুবোধই কুণ্ঠিত স্বরে আবার বললে, আমায় মাফ করুন, সুভদ্রা দেবী। আপনি যেতে বললেও যেতে পারি নি আমি, অনুমতি না নিয়েই আবার আপনার কাছে এসেছি।

বিহ্বলের মত সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই সুভদ্রা হঠাৎ ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে বললে, আমায় আপনি মাফ করুন, সুবোধবাবু, কিচ্ছু দোষ নেই আমার। আমায় কিছু না জানিয়েই কমলা আপনাকে খবর পাঠিয়েছে। ও নিজেও কিছুই জানে না, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই ও আপনাকে এত কঠিন অপমান করেছে।

না, সুভদ্রা দেবী।—সুবোধ চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আমার একটুও অপমান হয় নি। এ বরং ভালই হয়েছে। নিজে থেকে কথাটা তো কোন দিনই আমি মুখ ফুটে বলতে পারতাম না!

সুভদ্রার চোখের জল হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে থেমে গেল; সে বিহ্বল স্বরে বললে, কি বলছেন আপনি?

সুবোধ এক বার ঢোক গিলে আগের চেয়েও কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, কমলা দেবী ভুল ক'রে যা অনুমান করেছেন, তা কি সত্য হতে পারে না?

এবার সুভদ্রার চোখের তারা দুটিও যেন নিশ্চল হয়ে গেল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড কাল স্তব্ধ হয়ে সুবোধের আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে সবেগে মাথা নেড়ে বললে, না, না; কক্ষনো নয়। ছিঃ ছিঃ, এ কি কথা বলছেন আপনি?

তথাপি সুবোধ বললে, আমার জন্য নয়, সুভদ্রা দেবী। কেবল আপনার ওই অজাত সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যই এক দিনের একটা অনুষ্ঠান যদি হয়—

না।—বাধা দিয়ে সুভদ্রা দৃঢ় স্বরে বললে, সে জন্যও যা আপনারা বলছেন, তা হতে পারবে না।

তার পরেই আবার সে উত্তেজিত হয়ে উঠল; সুবোধের মুখের দিকে

সত্য না হয় ঢাকাই প'ড়ে থাকবে। কিন্তু আমার নিজের লজ্জা গোপন করবার জন্য মা হয়ে এত বড় একটা মিথ্যা কথা তাকে আমি শিখিয়ে দিতে পারব না।

কিন্তু সুবোধ হার মানলে না; মিনিট খানেক চুপ ক'রে থাকবার পর আবার সে কুণ্ঠিত অনুনয়ের স্বরে বললে, কমলা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই এ কথা আপনাকে আম বলছি সুভদ্রা দেবী, ঝোঁকের মাথায় আমাদের প্রস্তাবটাকে অগ্রাহ্য করবেন না আপনি। আমাদের এই সেকালের সমাজে মানুষের চলার পথটা তো সোজা নয়, সমতলও নয়। ক'দিন পরেই যে অবোধ শিশু আপনার কোলে এসে জুড়ে ব'সে আপনার কাছে পথ চলার ছাড়পত্র দাবি করবে, কেবল তার কথাটাই আপনি শান্ত হয়ে ভেবে দেখুন।

আমি ভেবেছি, সুবোধবাবু।—সুভদ্রা কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে উত্তর দিলে, মাসের পর মাস খুব ভাল ক'রেই ভেবেছি। ভেবেছি ব'লেই আপনাদের প্রস্তাব আমার অগ্রাহ্য।

সুবোধ ক্ষোভের স্বরে বললে, তবে কি নিজের সন্তানকে আপনি একেবারে নামহীন, গোত্রহীন, পরিচয়হীন, নিঃস্ব ক'রেই সংসারে ছেড়ে দেবেন?

সুভদ্রা কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট ক'রেই উত্তর দিলে সে, কি করব বলুন? তাই ব'লে যে তার পিতা নয়, তারই সন্তানত্বের তক্‌মা এঁটে সারাটা জীবন নিজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসংসারকেও প্রতারণা করবার মন্ত্র মা হয়ে তাকে আমি শিখিয়ে দিতে পারব না।

সুবোধের বিবর্ণ মুখ আরও যেন বিবর্ণ হয়ে গেল; কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সুভদ্রার আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে সে বললে, তবে আমায় অনুমতি দিন, সুভদ্রা দেবী, অরুণাংশুকেই সব কথা খুলে বলি।

কিন্তু কথাটা শুনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে সুভদ্রা দুই চোখ বড় ক'রে বললে, না, না, এ কি বলছেন আপনি!

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, অরুণাংশুকে কথাটা আমি খুলে বলতে চাই

আগে লিখে দাও তো তুমি, কারণটা পরে শুনো।

রক্ষা কর।—শঙ্কিত মুখে লঘু পরিহাসের একটা আভাস ফুটিয়ে তুলে সুভদ্রা হাত জোড় ক'রে বললে, ওই দুটি জিনিস তোমায় দিতে পারব না, কমলা। যার কোন দোষ নেই, দায়িত্ব নেই, তাকেই তুমি যে ভাবে আক্রমণ করেছিলে, তা তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। আসল মানুষটির খোঁজ পেলে তুমি হয়তো তাকে কেবল নখ আর দাঁত দিয়েই টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়বে। আমি, ভাই, সে রক্তারক্তি ব্যাপার চোখে দেখতে পারব না।

কমলা কিন্তু আরও গম্ভীর হয়ে বললে, না, সুভদ্রা,—এ ঠাট্টার কথা নয়। তার নাম আর ঠিকানা আমায় দাও,—ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে হবে।

এরও উত্তরে সুভদ্রা তামাশা ক'রেই কথাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কমলাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে অবশেষে সে-ও গম্ভীর হয়েই বললে, না, কমলা; ওসব হাঙ্গামের কোনই দরকার নেই।

কমলা ভ্রূভঙ্গী ক'রে উদ্ধত স্বরে বললে, কেন নেই, শুনি?

সুভদ্রা উদাসীনের মত উত্তর দিলে, কি হবে এ সব হাঙ্গাম ক'রে?

কমলা বললে, তার কাছ থেকে তোমার ন্যায্য অধিকার তোমায় আমি আদায় ক'রে দেব।

দাবি করবার মত কোন ন্যায্য অধিকার আমার নেই।—বলতে বলতে সুভদ্রা মুখ নামিয়ে নিলে।

শুনে কিছুক্ষণ কমলার মুখে যেন কোন কথাই ফুটল না; কিন্তু তার পর ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে ডাকলে, সুভদ্রা!

সুভদ্রা চমকে মুখ তুলে তাকাল; কিন্তু শান্ত গম্ভীর স্বরেই সে উত্তর দিলে, কেন মিছামিছি জিদ করছ, কমলা? তুমি যা ভেবেছ তা হবে না। আমার প্রতি ভালবাসাই যার শেষ হয়ে গিয়েছে, তারই দুয়ারে গিয়ে কাঙালিনীর মত আমি হাত পেতে দাঁড়াতে পারব না।

হাত পেতে দাঁড়াবি কেন?—কমলা অসহিষ্ণুর মত বললে তুই যাবি তোর আধিকারের দাবি নিয়ে।

অল্প একটু হেসে সুভদ্রা উত্তর দিলে, অধিকার ছাড়া যে দাবি, তারই আসল নাম ভিক্ষে।

কমলা আরও বিরক্ত হয়ে বললে, কি যা-তা বলছিস তুই? মেয়েমানুষ হয়ে এত খানি যাকে তুই দিয়েছিস, তার কাছে তোর কোন অধিকার নেই?

সুভদ্রা শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলে, দেওয়াটা আমার এক তরফা হয় নি, কমলা; দানের প্রতিদানে যা আমি পেয়েছি, তাতেই আমার দেওয়ার দাম শোধ হয়ে গিয়েছে।

শোধ হয়ে গিয়েছে?—বলতে বলতে কমলা উদ্ধত ভাবে সুভদ্রার প্রায় মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে গেল, কিসে শোধ হয়েছে? কি পেয়েছিস তুই? এই কলঙ্ক? ছিঃ ছিঃ সুভদ্রা, ভুলিয়ে ভালিয়ে যে কাপুরুষ তোর এত বড় সর্বনাশ ক'রে তার পর পিট্‌টান দিয়েছে, তাকে ছেড়ে দিবি তুই?

সুভদ্রা মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে উত্তর দিলে, না, কমলা; ভুলিয়ে কেউ আমার সর্বনাশ করে নি। যে মেয়েদের ভুলিয়ে তাদের সব চেয়ে বড় সম্পদ কেড়ে নেওয়া যায়, সে জাতের মেয়ে সুভদ্রা নয়।

আবার কিছুক্ষণ পর্যন্ত কমলার মুখে কোন কথাই ফুটল না। কিন্তু সুভদ্রার আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময়ে তার ঠোঁটের কোণে হাসির কয়েকটি রেখা ঝিলিক্ দিয়ে ফুটে উঠল। হাত বাড়িয়ে সুভদ্রার চিবুক টিপে ধ'রে সে কৌতুকের স্বরে বললে, বড় বেশি অভিমান হয়েছে, না?

ধেৎ!—ব'লে সুভদ্রা কমলার হাতখানাকে দূরে সরিয়ে দিলে। তার কানের কাছটা অল্প একটু লালও হয়ে উঠল।

কিন্তু উত্তরে কমলা আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বললে, 'ধেৎ' কেন বলছিস? আমি কি কচি খুকী? তা অভিমানে অন্ধ হয়ে নিজে যদি তুই পথে বসতে চাস, না হয় বসিস। কিন্তু পেটের সন্তানকেও ভিখারী ক'রে পথে বসাবি তুই কোন্ অধিকারে?

পথে কেন বসবে?—সুভদ্রা হেসে ফেলে বললে, তার মায়ের কোল নেই নাকি?

সুভদ্রা কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ করলে না; ধীরে ধীরে নিজের হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধীর স্বরে সে বললে, যে জিনিসের দরকার নেই, তা না পাওয়াকে বঞ্চিত হওয়া বলে না।

দরকার নেই কি বলছিস তুই?—কমলা বিহ্বল স্বরে বললে, পিতৃপরিচয়ের সম্ভ্রম না পেলে কি সন্তানের চলে?

চলে।—সুভদ্রা মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, নিজে যদি সে অপদার্থ না হয়, তবে তার পিতার পরিচয়ের কোন দরকার হয় না। আর নিজেই যদি সে অপদার্থ হয়, তবে পিতার পরিচয়েও তার কোন লাভ হয় না।

কিন্তু পিতার অর্থ? তারও কি দরকার নেই?

কি দরকার!—কত পিতারই তো অর্থ থাকে না।

কমলা নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখে সুভদ্রা অল্প একটু হেসে আবার বললে, অবাক কেন হচ্ছ, কমলা? এ তো খুব সোজা কথা। পিতার নাম আর অর্থই কোন সন্তানকে বড় করতে পারে না। মানুষ বড় হয় তার নিজের ক্ষমতায়।

কমলা তার স্তব্ধ ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যই যেন একটু ন'ড়ে চ'ড়ে সোজা হয়ে বসল; তার পর সে বললে, মানলাম হয়। কিন্তু কেবল টাকা-পয়সা আর সম্ভ্রমের কথাই তুই ভাবছিস কেন? এ দুটি জিনিস ছাড়াও পিতার কাছ থেকে সন্তান আরও কত অমূল্য জিনিস পেয়ে থাকে। স্নেহ মমতা—এ সব জিনিসের দরকার নেই তার?

ও সেই কথা!—ব'লে সুভদ্রা কুণ্ঠিতের মত মুখ নামিয়ে নিলে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই আবার সে মুখ তুলে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, ও সব জিনিসও অপরিহার্য নয়, কমলা। বাপের যে দানটা সন্তানের কিছুতেই না পেলেই চলে না আর যা সে ছাড়তে চাইলেও কিছুতেই ছাড়তেও পারে না, দেহ-গঠনের সেই অপরিহার্য উপাদান আমার সন্তান এরই মধ্যে পেয়ে গিয়েছে। বাকি যে সব জিনিসের কথা তুমি বলছ, বাপের কাছ থেকে তা না পেলেও সন্তানের বেশ চ'লে যায়, আমার নিজেরও তো চলেছে। বলতে বলতে ঘাড় নেড়ে মুখ টিপে একটু সে হেসেও নিলে।

কিন্তু ওই হাসি দেখেই কমলা হঠাৎ আগুনের মত জ্ব'লে উঠল।—চলেছে,

সুভদ্রা উত্তর দিলে না, তার নত মুখখানি আরও যেন নত হয়ে পড়ল।

সেই মুখের দিকে চেয়ে কমলা আবার ধমক দিয়ে বললে, চুপ ক'রে রইলি যে? এখানে বেশি দিন আর থাকা চলবে না। কলকাতায় আলাদা একটা বাসা পেলে থাকবি সেখানে?

মুখ না তুলেই কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে সুভদ্রা বললে, থাকব।

তার পর মুখ তুলে, অল্প একটু হেসে বিষণ্ণ স্বরে সে আবার বললে, আলাদা একটি বাসাই আমার চাই। কিন্তু ভাই, এই শরীর নিয়ে বাড়ি তো আমি নিজে খুঁজতে পারব না।

তা আমি জানি।—কমলা উত্তরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, ও কাজও আমাকেই যে করতে হবে তাও আমার কর্মে লেখা আছে।

শুধু এইটুকুই।—সুভদ্রা অপরাধীর মত বললে। কিন্তু তার পরেই আগের মত একটু হেসে আবার সে বললে, শুধু এইটুকু ক'রে দিলেই তোমার কর্মভোগ শেষ হবে, কমলা। তার পর আমার এই কালামুখ আর তোমায় দেখতে হবে না।

না দেখতে হ'লেই বাঁচি।—ব'লে কমলা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার পর বাইরেই চ'লে গেল সে।

দিন দুই পর কমলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকেই উৎসাহের স্বরে বললে, আর ভাবনা নেই, সুভদ্রা। বেশ ভাল বাড়ি পেয়ে গিয়েছি। একেবারে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের উপরেই, এখান থেকে মিনিট দশেকের মোটে পথ।

সত্যি?—সুভদ্রার গলার আওয়াজে অবিশ্বাস বেজে উঠল।

কিন্তু কমলা উৎফুল্ল স্বরেই উত্তর দিলে, সত্যি লো, সত্যি। বেশ ভাল বাড়ি পেয়েছি, বড় রাস্তা থেকে খুব দূরেও নয়, অথচ ছোট সরু নির্জন গলির উপর। নূতন বাড়ির ফ্ল্যাট;—বেশ বড় বড় তিনখানা ঘর। অথচ ভাড়াও তেমন বেশি নয়, মাত্র চল্লিশ টাকা।

কিন্তু সুভদ্রা বিব্রতের মত বললে, চল্লিশ তো কম নয়, কমলা! অত ভাড়া আমি দেব কোথা থেকে?

কিন্তু সুভদ্রা ওই হাসিতে যোগ দিলে না ; কমলার মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে সে বললে, আমার জন্য এ সব তুমি কেন করলে, কমলা ?

কুণ্ঠিত ভাবে এক বার চোখ নামিয়েও পরক্ষণেই আবার চোখ তুলে কমলা হেসেই ফেললে ; ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললে, ইস্—মেয়ের কথা শোন ! ওর জন্য করেছি !—উনি যেন আমার—

তবে কেন এ সব করতে গেলে তুমি ? কেন এত টাকা খরচ করলে ?

আমার খুশি। করেছি আমার নিজের জন্য। চিরটা কাল মেসেই কাটাব নাকি ?

একটু থেমে গম্ভীর স্বরে কমলা আবার বললে, সত্যি বলছি, বাসা করবার ইচ্ছে গোড়া থেকেই আমার ছিল। তুমি তো হ'লে তার উপলক্ষ্য মাত্র। তুমি এখানে না-ও যদি থাক, তবু আমার এ বাসা আমারই থাকবে।

পরদিন সকালে সুভদ্রার ঘুম যখন ভাঙল, তখন বেলা হয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে অনেকখানি রোদ ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। কমলার গলার আওয়াজও শুনতে পেলে সে। আর ওরই সঙ্গে জলের ছপ্ ছপ্, ঝাঁটার সপ্ সপ্ আর নানা রকম ভারী জিনিসের ওঠাপড়ার শব্দ। দোর খুলতেই তার চোখে পড়ল—কমলা সংসারের কাজে লেগে গিয়েছে। ভারি ব্যস্ত সে ; চাকরটাকে সে খাটিয়ে মারছে, নিজে খাটছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তার আঁচলের খানিকটা গিয়েছে ভিজে ; বুকের কাছে কাদা লেগেছে ; মাথার চুলে অনেকখানি ঝুল জড়িয়ে গিয়েছে ; কিন্তু সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের হাতের রচনাকেই বার বার ভেঙে নূতন ক'রে সে রচনা করছে, ক্লান্তিও নেই, তৃপ্তিও নেই। কখনও ব'কে, কখনও হেসে, কখনও বা গুন গুন ক'রে কোন একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ছেলেমানুষের মত অধীর আগ্রহে সে যেন কাজের খেলায় মেতে উঠেছে।

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, এ কি, কমলা—এ কি করছ তুমি ?

কমলা মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলে, ঠাকুরসেবা।

কি ?

সুভদ্রার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়েই কমলা হেসে ফেললে ; বললে, ওই

নিয়ে পরিশ্রমের কাজ করতে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে। কেবল নিজের বিপদ নয়, যার আসবার কথা আছে, তারও।

যাও।—সুভদ্রা লজ্জিত ভাবে চোখ নামিয়ে বললে, কিছু হবে না আমার। আমি কাজ করব।

কিন্তু সুভদ্রা তার হাতখানি টেনে ছাড়িয়ে নিতেই কমলার চোখ দুটি যেন জ্ব'লে উঠল। ভুরু বেঁকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, এমনি ক'রেই একটা সঙ্কট ডেকে এনে পেটের আপদটাকে তুমি বুঝি বিদায় করবার মতলব করেছ? কিন্তু আমি বলছি, আমি থাকতে তা হতে দেব না।

সুভদ্রার আরক্ত মুখখানি চক্ষের নিমেষে বিবর্ণ হয়ে গেল। বজ্রাহতের মত কমলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে ঘরের ভিতর ছুটে গিয়ে সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে দিলে।

কমলার মুখখানিও ম্লান হয়ে গেল। অপ্রতিভের মত কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে পরে ধীরে ধীরে সুভদ্রার ঘরের কাছে গিয়ে সে অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে ডাকলে, সুভদ্রা, রাগ করলে, সুভদ্রা?

উত্তর না পেয়ে নিজেই সে দোর ঠেলে ভিতরে চ'লে গেল। দেখলে, মেঘের মত মুখ ক'রে সুভদ্রা খাটের উপর ব'সে রয়েছে। ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে আবার বললে, আমার মাথাটাই কেমন যেন খারাপ হয়ে গিয়েছে, কি বলতে কি যে ব'লে ফেলি তার ঠিক থাকে না। অন্যায় যদি হয়ে থাকে, তুমি আমায় মাফ কর ভাই।

সুভদ্রা মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলে, না ভাই, তোমার কোন অন্যায় হয় নি।

কমলা এবার তার কাছে খাটের উপর ব'সে পড়ল; তার একখানা হাত কোলের উপর টেনে এনে কোমল স্বরে সে বললে, তুমি নিজেই তো জান, সুভদ্রা, মেয়েদের এ যে একটা নিদারুণ সঙ্কটের অবস্থা। নিজের জীবনের রস বিন্দু বিন্দু ঢেলে দিয়ে আর একটা জীবন তাকে গ'ড়ে তুলতে হয়। সেই দায় আছে ব'লেই তো এ সময়ে মেয়েদের দাবিও বেশি। বাইরে থেকে নিজের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে না নিলে আর একজনের দাবি তুমি মিটাবে কি দিয়ে?

উত্তরে সুভদ্রা মৃদু স্বরে বললে, তুমি কিছু ভেবো না, কমলা ; যার জন্য নিজের সকল সাধ আকাঙ্ক্ষাকে আমি বিসর্জন দিলাম, আমার সেই পরম ধনকে কিছুতেই আমি নষ্ট হতে দেব না। আপদ মনে করলে অনেক আগেই তাকে আমি বিদায় করতে পারতাম।

কিন্তু তার পরেই উদ্ধত ভাবে কমলার মুখের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে আবার বললে, কিন্তু, কমলা, তুমি তাকে সইতে পারবে তো ? বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে তোমাদের ভদ্র সমাজের বুকের উপরে যাকে আমি আবাহন ক'রে নিয়ে আসব, ললাটে কলঙ্কের পঙ্কতিলক পরা নামহীন, গোত্রহীন, মাতৃপরিচয়শূন্য আমার সেই জারজ সন্তানকে দেখে ঘৃণায় তোমার ভুরু দুটো কুঁচকে যাবে না তো ?

শুনে কিছুক্ষণের জন্য কমলা যেন হতভম্ব হয়ে গেলে ; কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েই সে-ও দৃপ্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলে, এ তুই কি বলছিস, সুভদ্রা ? যীশুখ্রীষ্টের পূজো করি আমি,—আমি ঘৃণা করব শিশুকে ? আমার রাগ করতে হয় তোর উপর করব ; ঘৃণা করতে হয় তা-ও তোকেই করব। তোর ভুল-চুকের জন্য অবোধ শিশুকে আমি ঘৃণা করতে যাব কেন ? সে বরং আসবে আমার পূজোর ঠাকুর হয়ে। তাইতেই না আমার এত আয়োজন ! নইলে কি দরকার ছিল আমার এই ঘর-বাড়ির ?

সুভদ্রা বোধ করি এ রকম উত্তর শুনবার আশা করে নি ; তাই স্তব্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কমলার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

কমলা প্রথমে চমকে উঠল ; তার পর সুভদ্রার মাথাটাকে সাগ্রহে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে সে বললে, ছিঃ, সুভদ্রা,—এ কি ছেলেমানুষি তোমার ! এ সব উদ্ভট ভাবনা এখন ছাড়। বাজে ব'কে আমাকেও মিছামিছি বকিয়ে মেরো না। ঘোরালো কথা আমি তো কিছুই বলি নি ! শুধু বলেছি, কাজ তোমার শরীরে সইবে না, এখন কিছু দিন তোমায় বিশ্রাম করতে হবে।

কমলার মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে উত্তর দিলে সুভদ্রা, বেশ, তাই করব। কিন্তু ভাবছি যে, এত যে তোমার কাছ থেকে আমি নেব, তার পর এ ঋণ আমি শোধ দেব কেমন ক'রে ?

তেমন কিছু না হ'লেও ঠিক কি হয়েছে, সে সম্বন্ধে শ্যামাচরণ উপর্যুপরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। সুবোধ অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তরই দিলে না; অনেক প্রশ্ন সে খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে এড়িয়ে গেল; শেষের দিকে সে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললে, তাঁর কিছু হয় নি, শ্যামাচরণদা, তিনি আমায় ডেকেও পাঠান নি। তাঁর এক বন্ধুই মিছামিছি ভয় পেয়ে আমায় খবর দিয়েছিলেন।

শ্যামাচরণ বিস্মিত হ'ল, সুবোধের মনের ভাবটা সে বুঝতে পারলে না। একটু চুপ ক'রে থেকে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আমি দিদিমণিকে একবার দেখে আসব?

সুবোধ উদাসীনের মত উত্তর দিলে, ইচ্ছে হয়, যেয়ো। তার পর সোজা হয়ে ব'সে শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আমার কোন চিঠি আছে, শ্যামাচরণদা?

চিঠি ছিল দুখানা, আর একখানা মোড়ক-আঁটা 'হরিজন'। সুবোধ কাগজখানাই আগে খুললে; প্রধান প্রবন্ধটি মন দিয়ে প'ড়ে কিছুক্ষণ সে অন্যমনস্কের মত চুপ ক'রে ব'সে রইল। তার পর খাম ছিঁড়ে আর একখানা চিঠি বের করলে সে।

চিঠি তার ঠাকুরমায়ের। আঁকা-বাঁকা কাঁচা হাতের লেখা। অনেক অভিযোগ, ভর্ৎসনা আর অনুনয়ের ভিতর দিয়ে স্নেহশীল নারীচিত্ত কৃতী পটুয়ার পাকা হাতের ছবির মত ফুটে উঠেছে। বুড়ী আশা এখনও ছাড়ে নি; চিঠিতে সেই তার মনের মত মেয়েটির কথা দু-তিন বার উল্লেখ ক'রে সুবোধকে আবার সে বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধ করেছে। পড়তে পড়তে সুবোধের ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু চিঠিখানি তখনই সে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললে।

দ্বিতীয় চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত, টাইপ-করা। সেখানা দু-তিন বার প'ড়ে সুবোধ একটি নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল; বললে, এখন একবার ব্যাঙ্কে যাচ্ছি, শ্যামাচরণদা, আর রাত্রের গাড়িতে আমি যাব দিল্লী।

দিল্লী!

হ্যাঁ, পার্টির একটা মীটিং আছে, আমার যাওয়া দরকার।

পারব না। মালিকদের সঙ্গে বিমলদের দলবন্দী হবার কথাটা সে দিন তুমিই তো আমায় শুনিয়েছিলে। আজ তা আবার ভুলে গেলে কেন?

শ্যামাচরণ লজ্জিত হয়ে বললে, না, ভুলি নি। আমি শুধু বলছিলাম যে, আমরাও যদি মজদুরদের কিছু পাইয়ে দিতে না পারি—

না, পারব না।—সুবোধ বাধা দিয়ে দৃঢ় স্বরে বললে, কারণ, দেবার ক্ষমতা যার হাতে আছে, সে জানে কার হাত দিয়ে কখন কতটুকু দিলে তার লাভ বেশি হবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সুবোধ আবার বললে, আর ও পথে আমরা যেতেও চাই নে, শ্যামাচরণদা। মজদুরকে অনেক বার অনেক কিছুই তো আমরা পাইয়ে দিয়েছি, সে যে আসলে কতটুকু তাই আমরা এবার যাচাই ক'রে দেখব। ডাক দেব ওদের সব ছাড়বার জন্য—তার সস্তাদামের চাল-নুন, তার মাগগী ভাতা, তার চাকরি, তার যথাসর্বস্ব।

শ্যামাচরণ বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলে, এ আপনি কি বলছেন, সুবোধবাবু?

খুব সোজা কথা; শ্যামাচরণদা।—সুবোধ অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, নিজের ভাল অনেক করা গিয়েছে, এবার মজদুর তার দেশের ভালর কথা একটু ভাল ক'রে ভাববে না? এবার যে আমাদের স্বাধীনতার লড়াই শুরু হবে—আর এই তো হবে আমাদের শেষ লড়াই।

এবার বুঝতে পারলে শ্যামাচরণ। কথাটা নূতন নয়; এ সম্বন্ধে সুবোধের সঙ্গে তার অনেক আলোচনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সংশয় তার দূর হয় নি। আজও সুবোধের কথা শুনে উৎসাহে সে চঞ্চল হয়ে উঠল না; বরং তার গম্ভীর মুখ আরও বেশি গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে সংশয়ের স্বরে বললে, কিন্তু সুবোধবাবু, ওরা যদি আমাদের এ ডাকে সাড়া না দেয়?

কিন্তু উত্তরে সুবোধ দৃপ্তঃ কণ্ঠেই বললে, তা হ'লে নিজেরাই ওরা প্রমাণ ক'রে দেবে যে, মজদুর-রাজের দাবি ওদের ভুয়ো,—স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার হবার যোগ্য ওরা নয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সে আবার বললে,

নিজের মুখখানা কালো হয়ে গেল; কিন্তু তার পরেই হেসে ফেলে সে বললে, আমার কথা আমি ভাবি নি, সুবোধবাবু, আপনিও ভাবেন না। অনেক ঝড়ই তো এ বাবৎ আমার উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছে, এবারকার ঝড়ে না হয় ভেঙেই পড়ব। ঘরে গিয়ে লুকোব না, সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

খুশিতে সুবোধের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সাগ্রহে শ্যামাচরণের একখানি হাত চেপে ধ'রে উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, তা হ'লেই হ'ল, শ্যামাচরণদা, তা হ'লেই অন্তত একটা চেষ্টা আমি ক'রে যেতে পারব। ওরা মজদুরকে যত খুশি টাকার লোভ দেখাক; আমি তাদের ডেকে বলব, আমি দেব শুধু দুঃখ, পরিশ্রম, অনাহার, আঘাত, হয়তো বা মৃত্যুও।

একটু থেমে সে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে আবার বললে, বিমলের সঙ্গে তোমার যদি দেখা হয়, শ্যামাচরণদা, তাকে আমার এই কথাগুলো এক বার শুনিয়ে দিও। ব'লো, গ্যারিবল্ডিই না হয় সেকেলে হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু চার্চিল তো হন নি! তাঁর কথার সঙ্গে এগুলো খুব বেমানান হবে না, চাই কি, স্ট্যালিনের কথার সঙ্গেও খানিকটা মিলে যেতে পারে।

দিন দশেক পর মনের মধ্যে অনেকখানি উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে সুবোধ দিল্লী থেকে হুগলীতে ফিরে এল।

দিল্লীতে সে গিয়েছিল ওদের পার্টির কার্যকরী সমিতির সভায় যোগ দিতে। ঐ উপলক্ষে অনেকের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছিল; আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল অনেক। ওরই ফলে তার অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয় দূর হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝে এসেছিল যে, এত দিন পর সত্যই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। এবার আর কেবল কথা নয়, এবার সবই কাজ। মস্তিষ্ক-সর্বস্ব কূটনীতির নিরর্থক কসরৎ, ছোটখাটো দেনা-পাওনার চুলচেরা হিসাব আর দলাদলির মাতলামি আর নয়,—এবার সত্যই স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম শুরু হবে। সুবিচারের প্রত্যাশা, রাজ-রোষের আশঙ্কা বা অরাজকতার বিভীষিকা এবার আর চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবে না। নৈষ্কর্ম্যের জড়তা আর নৈরাশ্যের অবসাদ এবার যে সত্য সত্যই কেটে যাবে, দেশব্যাপী মহৎ একটা প্রচেষ্টার ফেনোচ্ছল তরঙ্গের উপর আরোহণ ক'রে এবার নিজেও যে সে দিগ্বিজয়ে বের হতে পারবে, একটা বিপুল ও উদার

সার্থকতার মধ্যে স্বার্থান্ধ, সঙ্কীর্ণ জীবনের সকল ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে, এই কল্পনায় সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

তার মনের এই উল্লাস পরিহাসের ভিতর দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ল। শ্যামাচরণকে দেখেই হাসিমুখে সে জিজ্ঞাসা করলে, খবর কি, শ্যামাচরণদা?

শ্যামাচরণ উত্তরে বললে, খবর এখানে কোথায়, সুবোধবাবু? আমরা সবাই তো আপনার মুখেই খবর শুনবার আশা ক'রে আছি।

সে খবর পরে শোনাব।—সুবোধ বললে, তোমাদের খবর আগে বল।

আমাদের কোন খবর নেই।

বল কি শ্যামাচরণদা, একেবারে কোন খবর নেই? এ কি হতে পারে? ওদের মুকুটে নূতন কোন পালক বসে নি? মাগগীভাতার বাড়তি, নূতন একটা বোনাস, অন্তত নূতন একটা নুনের দোকান, এ রকম কিছুও হয় নি?

শ্যামাচরণ লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে; বললে, না, কিছুই হয় নি, সুবোধবাবু। হ'লেও খবর ব'লে তা আপনাকে জানাতাম না, কারণ ওদের কথা এখন আর আমি ভাবি নে। আর ভাবলেও তা একেবারেই অন্য রকমের ভাবনা।

অন্যরকমের!—সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, সেটা আবার কি, শ্যামাচরণদা?

শ্যামাচরণ হাসিমুখে উত্তর দিলে, সেটা আর এক দিন বলব। এখন আপনার খবর বলুন। দিল্লীতে কি ঠিক হ'ল?

তথাপি সুবোধ বললে, সেটা পরেই শুনো। আগে এখানকার খবর আমায় শোনাও।

না।—শ্যামাচরণ এবার জিদ ক'রেই বললে, আপনার খবর আগে বলুন। সত্যি, কিছু হবে এবার? স্বরাজের জন্য লড়তে সত্যি এবার ডাক পড়বে সকলের?

সুবোধ একদৃষ্টে কিছুক্ষণ শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হেসে ফেলে বললে, তোমার মত আমারও সন্দেহ ছিল, শ্যামাচরণদা; কিন্তু সেটা এবার ঘুচেছে। সত্যি, সত্যাগ্রহ এবার শীগগিরই শুরু হবে, আর ডাক পড়বে ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে সকলেরই।

শ্যামাচরণের কথা আর ব্যবহারের ভিতর দিয়ে এইমাত্র যা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তা কেবল আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীর উষ্মাই নয়, আঘাতদীর্ণ পিতৃহৃদয়ের অনেক অভিমান, অনেক বেদনাও ওর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। বয়স্ক পুত্রের এই আকস্মিক অন্তর্ধান সারদার বুকে আরও যে কত বেশি বেজেছে, তাও সে অনুমান ক'রে নিলে। তার মনের মধ্যে কেমন একটা বেদনা, কেমন যেন একটা সংশয়ও জেগে উঠল, পুত্রশোকবিহ্বলা প্রৌঢ়ার স্বামীকে এ সে কোথায় নিয়ে যাবার আয়োজন করেছে!

সে দিন রাত্রে এবং পরের সারাটা দিন অনেক রকম কাজের মধ্যেও এই চিন্তাটা সুবোধের মনের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ করতে লাগল। সন্ধ্যার পর আর থাকতে না পেরে শ্যামাচরণকে সে ব'লেই ফেললে, আগুনের মধ্যে তুমি যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, শ্যামাচরণদা, তাতে বউদির সম্মতি পাবে তো?

শ্যামাচরণ বিস্মিত হয়ে বললে, এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন, সুবোধবাবু?

সুবোধ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, তুমি তো সংসারে আমার মত নির্বন্ধন একক মানুষ নও, শ্যামাচরণদা, অসাধারণ কিছু একটা করতে গেলে বউদির মত তোমায় নিতে হবে বইকি!

শ্যামাচরণ কুণ্ঠিতের মত চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বললে, আগেও তো কোন দিন ওর মত নিই নি,—নেবার দরকারও হয় নি।

কিন্তু এবার মত নেওয়া দরকা :—সুবোধ আগের চেয়েও গম্ভীর স্বরে বললে, কারণ আগে যা হয়েছে আর এবার যা হবে, তাতে তফাত অনেক।

একটু থেমে সে আবার বললে, প্রাণটাকে হাতে নিয়ে তুমি যে পথে বেরিয়ে পড়বে, তার পর তোমার যদি কিছু হয় তখন ওঁকে দেখবে কে? আর কেবল বউদির কথাই তো নয়, ছোট একটি মেয়েও তো আছে তোমার!

শ্যামাচরণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে; বললে, এমন ক'রেই কথাটা যখন আপনি বলছেন তখন আমিও বলি, আপনারা ভগবান মানেন না, সুবোধবাবু, কিন্তু আমি মানি। তাই নিঃসংশয়েই আমি বলতে পারি যে, দরকার যদি হয় তবে সারদা আর তারাকে ভগবান নিজেই দেখবেন।

সুবোধ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর

মানে, আন্দোলন আবার আসছে কিনা! তবে তুমি যদি বারণ কর, তা হ'লে শ্যামাচরণদাকে ওতে আর আমি টানতে চাই নে।

কিন্তু এরই উত্তরে সারদা যা বললে, তা শুনে সুবোধের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। চকিতে এক বার শ্যামাচরণের মুখখানি দেখে নিয়ে ফিরে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, কিন্তু ও কি আমার বারণ মানবে? বলতে বলতে দুই কোঁটা চোখের জল তার গালের উপর ঝ'রে পড়ল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে সে গাঢ় স্বরে আবার বললে, আর ওকে বারণ আমি করতেও চাই নে। ভগবান যাকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে সংসারে পাঠিয়েছেন, আমার কি সাধ্য যে তাকে আমি লক্ষ্মীমন্ত করব? করবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশি। জলের মাছকে ডাঙায় টেনে তুললে তার যে অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা হয় ওঁর; মনে হয় যে, এই তিরিশ বছর যাকে নিয়ে ঘর করেছি, এ যেন সে নয়—এ যেন আর এক মানুষ। আমার নিজের মানুষটিই যদি বেঁচে না রইল, তবে ওঁকে বেঁধে রেখে আমার লাভ?

বিস্ময়ে সুবোধ একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। সারদার কথাগুলি কেবল যে তার কাছে অপ্রত্যাশিত, তা-ই নয়, ওর ভাষাও যেন তার দুর্বোধ্য। সারদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে সে,—প্রৌঢ়ত্বের ছাপ আঁকা ওই কুৎসিত মুখখানি নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতা সত্ত্বেও কি যেন একটা অপার্থিব মাধুর্যে স্নিগ্ধ। শ্যামাচরণের মুখের দিকেও সে চেয়ে দেখলে, তারও কুণ্ঠিত আনত মুখখানি যেন গর্বে ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিগত-যৌবন ওই দুটি নরনারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতেই সুবোধের নিজের অন্ধকার মনটাও হঠাৎ যেন আলোয় আলোময় হয়ে গেল। সে বুঝলে যে, রিক্ততার শূন্যতা থেকে মদের নেশার মত যে উন্মাদনা পাওয়া যায়, এ সে জিনিস নয়। এ প্রাপ্তি ও প্রাচুর্যের অমৃতময়ী প্রেরণা। এ জিনিস যে স্বর্গরাজ্যের অমূল্য সম্পদ, সেখানে তার নিজের প্রবেশের অধিকার নেই ব'লেই এ জিনিসটির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সে সন্দীহান হয়ে উঠেছিল। সে যে কত বড় ভুল, তাই বুঝতে পেরে হঠাৎ চোখ দুটি তার ছলছল ক'রে উঠল। সারদার কথার উত্তরে একটি কথাও তার মুখে ফুটল না।

জন্ত সে যে কি অধীর আগ্রহে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ছুটে যায়, তা সুবোধের অজানা নেই। বিশেষ ক'রে বিমলদের বিরুদ্ধে তার আক্রোশের তীব্রতা দেখে অতীতে সুবোধ নিজেও অনেক বার শিউরে উঠেছে। অথচ সেই শ্যামাচরণই এই যে আজ দেশের কথা, কাজের কথা ভেবে ওই বিমলদের হাতেই সকল কর্তৃত্ব সঁপে দিয়ে নিজেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলতে চাচ্ছে, এই ঘটনার অসাধারণত্ব সুবোধকে অভিভূত ক'রে ফেললে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সে বুঝতে পারলে যে, শ্যামাচরণ যা চায় তা হবার নয়। ওই একটি মুহূর্তের মধ্যেই বর্তমান দলাদলির ঐতিহাসিক পটভূমিটাকে সে যেন সমগ্রভাবেই দেখতে পেলে। কিছুদিন আগে এই হুগলীতেই অরুণাংশুর সঙ্গে তার নিজের যে সব কথাবার্তা হয়েছিল, তাও এই সম্পর্কে তার মনে প'ড়ে গেল। এই কারখানার ইউনিয়ন নিয়েই এখানে ছোট-বড় যত সব ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে এবং এখনও ঘটছে, ওর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ঈর্ষা যতটুকুই জড়িয়ে থাকুক না কেন, আসলে ওগুলি যে ব্যক্তিগত বা স্থানীয় ঘটনামাত্রই নয়, তাও সে নিঃসংশয়েই অনুভব করলে। কাজেই শ্যামাচরণের প্রস্তাব তার মনের মধ্যে প্রবল একটা আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে থাকলেও উত্তরে বলবার মত সঙ্গত কোন কথা সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

কিন্তু তার চিন্তিত, গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ প্রত্যাশীর মত চেয়ে থাকবার পর শ্যামাচরণই আবার বললে, কি বলেন, সুবোধবাবু? ওঁদের রাজী করতে পারলে খুব ভাল হয় না?

সুবোধ এবার ন'ড়ে বসল; শুকনো রকমের একটু হাসি হেসে বললে, ভাল তো নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু ওরা রাজী হবে না, শ্যামাচরণদা। তুমি তো জান, দেশের স্বাধীনতা ওদের কাছে গৌণ; ওদের মুখ্য লক্ষ্য আর একটা জিনিস।

এটা অকাট্য যুক্তি; শ্যামাচরণ একে খণ্ডন করবার জন্য চেষ্টাও করলে না। একটু চুপ ক'রে থেকে সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, ওরা যদি আগের মত নিরপেক্ষও থাকত, আমি তেমন ভাবতাম না। কিন্তু বুঝতে পারছি যে, এবার ওরা আমাদের বাধা দেবে।

সুবোধ মৃদু স্বরে বললে, তা ঠিক।

সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে শ্যামাচরণ বললে, সেই জন্যই এক বার চেষ্টা ক'রে দেখতে বলছি আপনাকে। না হয় ফল না-ই হবে। কিন্তু ফলের আশা ছেড়ে দিয়েই তো কাজ করতে হয়।

সুবোধ হেসে ফেলে বললে, বেশ তো, শ্যামাচরণদা, তুমিই ব'লে দেখ না একবার।

না, সুবোধবাবু।—শ্যামাচরণ মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, আমি বললে, কিছুই হবে না। আপনাকেই কথাটা বলতে হবে, আর আমার মতে বলাও উচিত।

সুবোধ উত্তর দিলে না, ভিতরে তার মনটা রীতিমত সক্রিয় হয়ে উঠল। অরুণাংশুর কথা বার বার তার মনে পড়তে লাগল,—অনেক দিন অরুণাংশুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি,—ইতিমধ্যে তার মতের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না, কে জানে! সুবোধের মনে হ'ল যে, কথা বললে অরুণাংশুর সঙ্গেই কথা বলতে হয়,—বললে লাভ যদি কিছু নাও হয়, লোকসান হয়তো হবে না।

তাই একটু পরে শ্যামাচরণ আবার যখন তাকে অনুরোধ করলে, তখন সুবোধ মুখখানি হাসবার মত ক'রে বললে, বেশ তো, শ্যামাচরণদা, তুমি যখন নাছোড়বান্দা, তখন নিষ্কাম ভাবেই চেষ্টা একবার ক'রে দেখব।

পরদিন সকালেই সে বিমলের আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ঘটনাটি অসাধারণ। এক দিন অবশ্য এরা দুজন কেবল সহকর্মীই ছিল না, বন্ধুও ছিল। একই কর্মক্ষেত্রে এরা একত্র কাজ করেছে, একত্র দুঃখ ভোগ করেছে, সাফল্যের আনন্দ আর ব্যর্থতার বেদনা সমান ভাগে বেঁটে নিয়েছে। কিন্তু সে যেন এক সত্যযুগের কথা। ইদানীং উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল, আর তা-ও নিতান্তই কে-আক্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রাজনৈতিক দলাদলির বিষাক্ত বাতাস ওদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধটিকে পর্যন্ত আক্রমণ ক'রে কলুষিত করতে বাকি রাখে নি। ওরই মধ্যে আবার সুভদ্রার নামের মিশাল দিয়ে যে জিনিসটির সৃষ্টি হয়েছে, তার কদর্যতা ও বিষাক্ততা তো একেবারে অনুপম। ফলে অতীতে বন্ধুরা হয়েছে বর্তমানের শত্রু। সুবোধ দেশ থেকে ফিরে আসবার পর এদের দুজনের দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হয় নি,—বাড়ির বাইরে

তাঁর পেরে কলকাতায় ফিরে আসেন। তার পর থেকেই তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতায় ওঁরা তাই থেকে অনুমান করেছেন যে, হয়তো উনি বিয়ের জন্যই এলাহবাদে চ'লে গিয়েছেন।

সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। অরুণাংশুর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যা অনুমান করেছে, সুবোধ তা অবিশ্বাস করতে পারলে না। স্বয়ং অরুণাংশুকেই কথাটা জিজ্ঞাসা করবার জন্য মন তার চঞ্চল হয়ে উঠল। অসহিষ্ণুর মত বিমলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে। কিন্তু উত্তরে বিমল একটিমাত্র সঠিক খবর যা দিতে পারলে তা এই যে, অরুণাংশুর বর্তমান ঠিকানা বিমল বা তার পরিচিত একটি লোকেরও জানা নেই,—প্রবীরদা নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন যে, বালিগঞ্জের বাড়িতে প্রকাণ্ড তালা আর 'টু-লেট' নোটিশ ঝুলছে।

এমন একটা সংবাদ শোনবার পর সুবোধের মুখে আর কোন কথা ফুটল না। তার বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে বিমলই আবার বললে, অরুণদাকে আমারও খুব দরকার আছে, সুবোধদা,—তাঁর খবর পেলেই আপনাকে আমি জানাব।

তাই জানিও।—ব'লে সুবোধ অন্যমনস্কের মত বের হয়ে এল।

ইতিমধ্যে তার মনের একটা বিপ্লব ঘ'টে গিয়েছে। পথে যখন সে এল, তখন তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা অক্ষম হাহাকার শুকনো চৈতালী ঘূর্ণির মত পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠে তার মনোজগৎটাকে ছেয়ে ফেলেছে। শ্যামাচরণের কথা বা কাজের কথা তখন আর তার মনেও পড়ল না; এমন কি, অরুণাংশুর মুখখানাও যেন ধূলাবালির আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেল; আর বিমল যার নাম পর্যন্ত মুখেও আনে নি, যার কথা সেদিন নিজে সে এক বারও ভাবে নি, সেই সুভদ্রাকেই কেবল বার বার তার মনে পড়তে লাগল,—সেই তার ম্লান মুখ, সেই তার ফুলে ফুলে কান্না, সেই তার ব্যর্থ জীবনের সকরুণ ইতিহাস। হতভাগিনী সুভদ্রা!—সুবোধের কেবলই মনে হতে লাগল যে, এবার সুভদ্রার দুর্ভাগ্যের পাত্রটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সব হারিয়েও এত দিন আশা হয়তো তার ছিল, অরুণাংশুকে আবার ফিরে পাবে সে; অন্তত অরুণাংশুর সঙ্গে তার পুনর্মিলনের একটা সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু অরুণাংশুর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সম্ভাবনারও সমাধি হয়ে গেল, আশা

করবার শেষ উপলক্ষটিকেও হারিয়ে হতভাগিনী সুভদ্রা এবার সত্য সত্যই নিঃস্ব হয়ে পড়ল।

তখন বেশ বেলা হয়েছে। কাছেই কারখানা চলেছে পুরাদমে, ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্, সোঁ-সোঁ শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। বড় রাস্তায় লোকজন, গাড়িঘোড়া চলেছে বন্যার জলের মত। কিন্তু এর কিছুই সুবোধের চোখে পড়ল না, কোন শব্দই তার কানে গেল না। কেবল সুভদ্রার অশ্রুকলঙ্কিত ম্লান মুখখানিই সে যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, আর বাষ্পীয় যন্ত্রের জঠরস্থ বাষ্পের মত একটা অন্ধ উন্মত্ত আবেগ যেন সেই মুহূর্তেই ওই সুভদ্রার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবার জন্য ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কিন্তু স্টেশন পর্যন্ত যাবার আগেই হঠাৎ এক সময়ে বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই তার মনে প'ড়ে গেল, সুভদ্রা তার আগের বাসায় নেই, কোথায় আছে তাও তার অজ্ঞাত। মনে পড়তেই চমকে থমকে দাঁড়াল সে, সঙ্গে সঙ্গেই গভীর অবসাদে তার শরীর ও মন দুই-ই যেন এলিয়ে পড়ল।

এগিয়ে আর যেতে পারলে না সে; অক্ষম অনিচ্ছুক পা দুটিকে টেনে টেনে রাজপথ থেকে একটু দূরে গিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় ঘন একটা ঝোপের আড়ালে সে নির্জীবের মত ব'সে পড়ল। ভিতরে তার মনটা 'হায় হায়' করতে লাগল,—সুভদ্রার জন্য আর কিছুই তার করবার নেই, কাছে গিয়ে তাকে যে সে দুটি সান্ত্বনার কথা ব'লে আসবে সে পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরে তার চোখের সামনে তখনও কেবল সুভদ্রার মুখখানিই যেন ভেসে বেড়াতে লাগল, কিন্তু সে মুখ আর এক রকমের। বিচিত্র সে মুখ,—বেদনায় ম্লান হ'লেও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় পাথরের মত কঠিন; একটা অন্ধ ঔদাসীন্য, একটা নির্মম প্রত্যাখ্যান যেন দুর্ভেদ্য দুর্গের মত তাকে ঘিরে রয়েছে। সেদিন হাসপাতালের কেবিন-ঘরে সুভদ্রার এই মুখ দেখেই সসম্ভ্রম বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দৃষ্টিহীন চোখ দুটি দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর সুবোধ শরীরটাকে নাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল; সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে মনে মনে সে বললে, ভালই হয়েছে যে, যাবার আগে সুভদ্রা

দিন কয়েক পর সুবোধ সন্ধ্যার কাছাকাছি শুকনো ম্লান মুখে আপিসে ফিরে এসে শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কিছুই হ'ল না, শ্যামাচরণদা ; টাকার জোগাড় হ'ল না।

শ্যামাচরণের মুখও শুকিয়ে গেল ; সে বললে, তা হ'লে তো মুশকিল হ'ল, সুবোধবাবু। টাকা না হ'লে এদিকে যে আর এক পা-ও চলবার উপায় নেই।

ধারে ইস্তাহারগুলো পাওয়া যায় না ? অন্তত অর্ধেক ?

না, টাকা না হ'লে ওরা একখানাও দেবে না ব'লে দিয়েছে।

একটি নিশ্বাস ফেলে সুবোধ বললে, তবে আজ থাক্, শ্যামাচরণদা, কাল আর এক বার চেষ্টা ক'রে দেখব।

কিন্তু পরদিন খুব ভোরেই শ্যামাচরণের বাসায় গিয়ে সুবোধ উৎফুল্ল স্বরে বললে, তোমার কোন ভাবনা নেই, শ্যামাচরণদা, আজ বৈকালেই পুরো টাকা তোমায় আমি এনে দেব।

শ্যামাচরণ সন্দিগ্ধ স্বরে বললে, সত্যি বলছেন ? কোথায় পাবেন এত টাকা ?

সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, তা তোমার জানবার দরকার নেই। তুমি এখন চট্ ক'রে দুমুঠো ভাতে-ভাতের ব্যবস্থা কর দেখি, এই আটটার গাড়িই আমি ধরতে চাই।

দশটা বাজতে না বাজতেই সুবোধ কলকাতায় ক্লাইভ স্ট্রীটের উপর প্রকাণ্ড একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সেটি বিশ্ববিখ্যাত একটি ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত ধনাগার। দুর্গের মত শক্ত, পাকা বাড়ি ; উপরে আপিস, মাটির নীচে কংক্রিটের গুদাম। চোর-ডাকাত এবং বিশেষ ক'রে এ যুগের বোমারু বিমানের আক্রমণ থেকে সকলের মূল্যবান মণিমুক্তা আর দলিলদস্তাবেজ বাঁচাবার জন্য মাটির নীচে দুর্গের মধ্যে আর একটি দুর্গ গড়া হয়েছে। বোমার ঘায়ে বাড়ি যদি ভেঙেও পড়ে, তবু মাটির নীচে রক্ষিত মালপত্র নষ্ট বা লুণ্ঠিত হবে না। ব্যবস্থা নিখুঁত। কংক্রিটের দুর্গের মধ্যে ইস্পাতের আলমারি সারি সারি সাজানো রয়েছে ; প্রত্যেকটিতেই পায়রার খোপের মত অসংখ্য খোপ। অল্প হারে দক্ষিণা দিয়ে যে কোন লোক যে কটি ইচ্ছা খোপ ভাড়া নিয়ে ওর মধ্যে যে কোন জিনিস

সুবোধের পাশাপাশি চলতে চলতে উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বললে, ভাগ্যিস আজ আপনার দেখা পেলাম আমি! সেদিন না জেনে আপনার উপর কত বড় অবিচারই না করেছিলাম! অথচ অমন তাড়াতাড়ি আপনি চ'লে গেলেন—আপনার কাছে মাফ চাইবারও সময় পেলাম না।

না না।—সুবোধ কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, তার কিছু দরকার ছিল না।

আপনার দিক থেকে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই ছিল।—কমলা বাধা দিয়ে বললে।

প্রসঙ্গটাকে এড়াবার জন্যই সুবোধ জিজ্ঞাসা করলে, সুভদ্রা দেবী কেমন আছেন?

আছে ভালই।—কমলা উত্তরে বললে, মানে, তার অবস্থায় মেয়েমানুষ যেমন ভাল থাকতে পারে তেমনি আছে।

তার পরে তার আগের কথাটারই খেই ধ'রে সে আবার বললে, সুভদ্রার কাছে সব কথাই আমি শুনেছি, সুবোধবাবু; শুনে আপনার ওপর কি শ্রদ্ধাই যে আমার হয়েছে, মনে হচ্ছে যে হেঁট হয়ে এখনই আপনার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিই।

না না।—সুবোধ সঙ্কুচিত হয়ে বললে।

না আবার! কমলা উত্তর দিলে ঝাঁজের স্বরে, কোন পুরুষ কোন মেয়ের জন্য যা করতে পারে না, ওর জন্য তা-ই আপনি করতে চেয়েছিলেন। ও নিতান্ত উন্মাদ ব'লেই না আপনার অত বড় দানটাকে প্রত্যাখ্যান করলে!

না, কমলা দেবী।—সুবোধ এবারেও কুণ্ঠিত স্বরেই বললে, উনি ঠিকই করেছেন। আমারই ভুল হয়েছিল; শুধু ভুল নয়, অন্যায়। ওর [illegible] সত্যনিষ্ঠা সে ভুলের নাগপাশ থেকে আমাদের দুজনকেই রক্ষা করেছে।

কমলা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে এক বার সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর আবার চলতে শুরু ক'রে সুরটা একটু নামিয়ে আবার বললে, ও-কথা আমি বুঝি, সুবোধবাবু; আমার ধর্ম আলাদা হ'লেও আমিও তো এই দেশেরই মেয়ে। তবু ওই হতভাগিনী মেয়েটার জন্য বড় দুঃখ হয় আমার। এত বড় কলঙ্কের এত কালি মুখে মেখে ও যে কেমন ক'রে এই দশজনের সংসারে বেঁচে থাকবে, তাই আমি ভেবে পাই নে।

ঠিক এই কথা এই রকমেই সুবোধ বরাবরই ভেবে এসেছে। তাই আজ কমলার কথার কোন প্রত্যুত্তর তার মুখে ফুটল না।

একটু পরে কমলাই তার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, জানেন, সুবোধবাবু? সুভদ্রা আলাদা একটা বাসা নিয়ে সেখানে একা থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার সাহস হ'ল না; ভয় হ'ল, পাছে দুঃখ আর নৈরাশ্যের তাড়নায় ও ভয়ঙ্কর কিছু একটা কাজ ক'রে বসে। তাই নিজেও আমি ওর ওখানেই উঠে এসেছি।

তাই নাকি?—সুবোধ সচকিত বিস্ময়ের স্বরে বললে; তার কুণ্ঠিত, নিষ্প্রভ চোখ দুটি সহসা কৌতূহল আর প্রত্যাশায় যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

সে দিন সুবোধ চ'লে যাবার পর যে সব ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলি কমলা সংক্ষেপে সুবোধকে শুনিয়ে দিলে; বাসার কথা, নূতন-পাতা সংসারের কথাও বাকি রাখলে না।

শুনে সুবোধের বুকের উপর থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গাঢ় স্বরে সে বললে, আমার মস্ত একটা দুর্ভাবনা আজ কেটে গেল, কমলা দেবী। আমি তো চেষ্টা ক'রেও ওঁর কোন উপকার করতে পারি নি, ওঁর এই সঙ্কটের কালটা কোথায়, কেমন ক'রে কাটবে, তাই ভেবে মনে মনে কেবল দুঃখ আর উদ্বেগই ভোগ করেছি। উনি আপনার আশ্রয় পেয়েছেন জেনে আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ওঁর এই দুর্দিনে আপনি যা ওঁর জন্যে করেছেন, তার তুলনা হয় না।

নিজের প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে কমলা মুখ ফিরিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমি আর কি করেছি, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যা কর্তব্য, তার বেশি কিছু তো নয়—

কিন্তু সে-ও তো সামান্য নয়!—সুবোধ উচ্ছ্বাসের স্বরেই উত্তর দিলে, সংসারে কজন বন্ধু বন্ধুর প্রতি কর্তব্য ক'রে থাকে?—আর তা-ও এ রকম অবস্থায়! সাহায্য করা দূরে থাক্, এ অবস্থায় সব বন্ধুই তো ধিক্কার দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আপনি ওঁর জন্য যা করেছেন এবং করছেন, এ তো সত্যি অতুলনীয়!

না।—কমলা আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে বললে, এ অতি সামান্য,—কিছু নয়

তা বটে।—কমলা একটি নিশ্বাস ছেড়ে বললে, থাক্ তবে। ওর মুখ থেকেই কথা যখন আমি বের করতে পারি নি, তখন আপনাকে আর কি বলব! চলুন, পথ এবার খুলেছে।

বড় রাস্তাটা দুজনে নিঃশব্দেই পার হয়ে গেল। কিন্তু ও-পারের ফুটপাথে গিয়ে উঠবার পরেই কমলা আবার সুবোধের কাছে এগিয়ে এসে বিষণ্ণ, গম্ভীর স্বরে বললে, আমিও হাল ছেড়ে দিয়েছি, সুবোধবাবু। তবে এখনও থেকে থেকে কেবল এই কথাটাই আমার মনে উঠছে—যে লোকটা ওর এত বড় সর্বনাশ করতে পেরেছে, সেই নরপশুটাকেই এত ভাল ও বাসল কেমন ক'রে?

সুবোধ চমকে কমলার মুখের দিকে তাকাল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে সে বললে, আপনাদের বাসা আর কত দূর?

মৃদু স্বরে উত্তর হ'ল, না, আর বেশি দূরে নয়, প্রায় এসেই গিয়েছি আমরা।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে সুবোধের মনে হচ্ছিল যে, তার হৃদ্‌যন্ত্রটার গতি যেন তিন গুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সুভদ্রার উপর তার চোখ পড়তেই এক নিমেষেই সেটা যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

নিজের ঘরে তক্তপোশের উপর ব'সে সুভদ্রা এক মনে ছোট একখানা কাঁথা সেলাই করছিল। এক নিমেষের দেখাতেই সুবোধ বুঝলে যে, যে সত্যটা এত দিন ঢাকা ছিল, সেটাই এবার স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সে দিন হাসপাতালে যে সুভদ্রাকে সে দেখে গিয়েছিল, একে সেই মেয়ে ব'লে যেন চেনাই যায় না। এর দেহের গঠনে, কেশের রুক্ষতায়, চোখের নীচের ঘন কালিমায়, মুখের অসাধারণ পাণ্ডুরতায় আসন্ন মাতৃত্বের অবিসংবাদিত সব প্রমাণ আঁকা হয়ে গিয়েছে; হাতের কাজের ভিতর দিয়ে উপচে পড়ছে ওর ভরা বুকের বাৎসল্যরস; পাণ্ডুর মুখের শান্ত গাম্ভীর্যে মাতৃত্বের অনৈসর্গিক মহিমা দীপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এত দিন যা ছিল শোনা কথা মাত্র, তাই আজ সুবোধ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলে। আজ সে নিঃসংশয়েই বুঝলে যে, সুভদ্রার গর্ভে সন্তান রয়েছে, আর সে সন্তান অরুণাংশুর।

বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই কমলার মুখের কথাটা সুবোধের মনে প'ড়ে গেল,—এত ভাল তাকে ও বাসলে কেমন ক'রে!

বিশেষ ক'রে শেষের দিকে কমলার সেই প্রশ্নটা—আপনিও কিছু করতে পারলেন না, আপনি তো সবই জানেন! হঠাৎ শক্ত আঘাত চিন্তার বিশেষ একটা নূতন ধারাকে খুলে দিয়েছিল। সেই স্রোতই এখন তরতর ক'রে ব'য়ে চলল।

মনটা তার 'হায় হায়' ক'রে উঠল, এ কি সর্বনাশ করেছে সে! সুভদ্রার নিষেধকে অগ্রাহ্য ক'রে সময় থাকতে অরুণাংশুকে খবরটা জানিয়ে দিলেই হয়তো সুভদ্রার জীবনের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। অরুণাংশুর মত লোক হয়তো তার পিতৃত্বের দায়িত্ব অস্বীকার ক'রে সুভদ্রাকে অকূলে ভাসাত না। কিন্তু অরুণাংশুকে কথাটা সে জানায় নি কেন? সুভদ্রা নিষেধ করেছিল, তাই? ছোট একটা সত্য রক্ষা করবার জন্য অনেক বড় আর একটা সত্যকে এত দিন সে গোপন করেছে কেন?—একটার পর আর একটা প্রশ্ন সুবোধের মনে জেগে উঠতে লাগল। শুধু প্রশ্ন নয়, ওদের উত্তরও। ঘন মেঘের ফাঁকে সূর্যের উঁকিঝুঁকির মত একটা যেন নূতন সত্যের আভাস পাচ্ছিল সে। গর্ভবতী সুভদ্রার লজ্জাকুণ্ঠিত চোখের দিকে তাকিয়ে এক নিমেষেই সেই কঠিন, ভাস্বর সত্যের পরিপূর্ণ রূপটিকে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

সে তার এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। শুধু সুভদ্রার পরিপূর্ণ রূপটিকেই নয়, দর্পণের মত সুভদ্রার রূপের মধ্যে সে তার নিজের আসল রূপটিকেও যেন প্রত্যক্ষ করেছে। হতভাগিনী সুভদ্রার চরম সর্বনাশের জাজ্বল্যমান রূপের মধ্যেই তার নিজের অবিস্মরণীয় ও অমার্জনীয় অপকীর্তির কুৎসিত রূপকেও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে। ওরই প্রতিক্রিয়ায় তার শরীর ও মন বার বার শিউরে উঠতে লাগল; প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হতে লাগল যে, একা অরুণাংশুই সুভদ্রার সর্বনাশ করে নি, সত্য কথাটা জানবার পরেও সময় থাকতে সকল কথা অরুণাংশুকে না জানিয়ে সে নিজেও ওই সর্বনাশের আগুনে বার বার ইন্ধন জুগিয়েছে। সুভদ্রার নিষেধাজ্ঞাটির আশ্রয়ে এত দিন তার নিজের মনের কালো কামনাটিই যে তার কাছে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে, এই রূঢ় সত্যটির নিঃসংশয় উপলব্ধিই হঠাৎ যেন কঠিন আঘাত দিয়ে তার মনটাকে একেবারে বিকল ক'রে দিলে। তার অপরাধী অনুতপ্ত চিত্ত বার বার যেন 'হায়' 'হায়' ক'রে বলতে লাগল, সর্বনাশ করেছে সে; দুঃখে সমব্যথিনী, কর্মে

সহকারিণী, মূর্তিমতী মমতা ও প্রেরণার মত যে মেয়েটি চাওয়ার অপেক্ষা না ক'রে, নিজের লাভ-লোকসানের কোন হিসাব না ক'রে কেবল নারীর যৌবন-সমৃদ্ধ দেহটিকে ছাড়া মানুষের কাছে মানুষের কাম্য আর সকল জিনিসই লক্ষ্মীর মত উদার হয়ে বার বার তাকে দান ক'রে এসেছে, নারী-হৃদয়ের অমৃতরসও তেমনি অকৃপণ হস্তে পরিবেশন ক'রে তার হৃদয়ের পাত্রটি কানায় কানায় ভ'রে দিয়েছে, অত্যন্ত স্থূল, প্রচ্ছন্ন একটা আত্মস্বাৎপ্রবৃত্তির তাড়নায় প্রতিশ্রুতি পালনের অজুহাতে অরুণাংশুর কাছে সত্য গোপন ক'রে সেই মেয়েটিরই এ কি নিদারুণ সর্বনাশ করেছে সে! বিশ্বের সমস্ত সম্পদ ক্ষতিপূরণ দিয়েও তো এর ব্যর্থ জীবনকে আজ আর সার্থক করবার উপায় নেই!

কমলার কাছ থেকেও আত্মগোপন করবার চেষ্টায় কুণ্ঠিত, বিবর্ণ মুখখানিকে নত ক'রে সুবোধ জড়সড় হয়ে ব'সে রইল। মিনিট পাঁচেক পর সুভদ্রা আবার যখন তার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন তার মুখের দিকে চোখ তুলে সে তাকাতেই পারলে না।

কিন্তু সুভদ্রার ব্যবহারে একটুও সঙ্কোচ প্রকাশ পেল না। সুবোধের ঠিক সামনের চৌকিখানিতেই ব'সে প'ড়ে মুখ টিপে অল্প একটু হেসে সে বললে, তবু ভাল যে, আপনি এলেন; আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

বিস্মিত হবার মত মনের অবস্থা থাকলে সুবোধ বিস্মিতই হয়তো হ'ত, কিন্তু কোন রকম ভাব তার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠবার আগেই কমলা কুণ্ঠিত হাসিভরা চোখে এক বার সুভদ্রা ও এক বার সুবোধের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, সুবোধবাবুকে বলতে সাহস হচ্ছিল না, সুভদ্রা, গরিবের বাড়িতে ঠিক সময়েই যখন দয়া ক'রে উনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন দুটি শাকভাত ওঁর পাতে দিয়ে ধন্য হবার ইচ্ছে হচ্ছে আমার। তুই দেখ্ না জিজ্ঞেস ক'রে, আমাদের ক্ষুদকুড়ো ওঁর মুখে রুচবে?

সুভদ্রা সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সহাস্য কণ্ঠে বললে, দুটি ভাত খাবেন, সুবোধবাবু?

না।—সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, এই তো একটু আগে খেয়ে এসেছি, খেয়েই গাড়িতে চেপেছিলাম কিনা!

মনে কোন দুঃখ আছে। এর চোখ স্বচ্ছ, দৃষ্টি সোজা, মাঝে মাঝে তাতে যে লজ্জার আবেশ নেমে আসছে, তাতে মাধুর্যই আছে, অনুতাপ বা ভীতির আভাসমাত্রও নেই। এর মুখের কৌতুকের হাসি এক মধুর বিস্ময়। একটু আগেই সর্বনাশের যে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছে মনে ক'রে সুবোধ ভয়ে দুঃখে ও অনুতাপে শিউরে উঠেছিল, তার সঙ্গে এ সুভদ্রার কোন জায়গাতেই যেন মিল নেই।

এ ঘরে সুভদ্রাকে প্রথমে দেখেই সুবোধ বিস্মিত হয়েছিল। এবার তার সকৌতুক, সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে সে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল।

বিস্মিত সুবোধকে আরও বিস্মিত ক'রে দিয়ে সুভদ্রাই আবার বললে' আমার ভাগ্য ভাল যে, কমলার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল। সেই জন্যই তো আপনার দেখা আজ পেলাম।

সুবোধ উত্তর দিলে না; কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রাই আবার বললে, কত দিন কত বার যে আপনাদের কথা আমার মনে হয়েছে, বললে হয়তো আপনি বিশ্বাসই করবেন না। সত্যি, অনেক কথা জানতে সাধ হচ্ছে আমার। বলুন, সুবোধবাবু, কি করছেন আজকাল? কাগজ প'ড়ে সব কথা বুঝতে পারছি নে।

সঙ্কোচ ভাঙতে কিছু সময় লাগল; কিন্তু ধীরে ধীরে অনেক কথাই খুলে বললে সুবোধ,—বর্তমান অবস্থা, আগামী আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবিতা, ওর পরিকল্পনা, ওর দাবি, ওরই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আরও অনেক কথা।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠল। সে প্রশ্ন করলে না, সমালোচনা করলে না; কেবল অনেকক্ষণ পর সুবোধের কথার মাঝখানেই হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, এত বড় একটা কাজের সময়ে আমি যে আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না, সুবোধবাবু, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।

বাধা পেয়েই সুবোধ থেমে গিয়েছিল। সুভদ্রার কথা শুনে তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। না-পাওয়ার অবিসংবাদিত উপলব্ধির মধ্যেও মাঝে মাঝেই সুনিশ্চিত প্রাপ্তির নিবিড় আনন্দ তার বুকের মধ্যে যে আবেগের সৃষ্টি করেছে, এখনও সেই আবেগই যেন তার অন্তরের

মনটা যে ওই বাক্সের উপরেই প'ড়ে রইল, তার প্রমাণ প্রতি মুহূর্তেই তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ফুটে উঠতে লাগল। কতকটা সন্দেহ, কতকটা কৌতুকের দৃষ্টিতে সুভদ্রা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর বাক্সটা আবার হাতে তুলে নিয়ে আবদারের মত ক'রে বললে, বলুন না, সুবোধবাবু, কি আছে এতে?

সুবোধ খাওয়াই যেন ভুলে গেল; তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে আবার ব্যাকুল স্বরে সে বললে, ওটা আমায় ফিরিয়ে দিন, সুভদ্রা দেবী, ওতে কিছু নেই।

উহুঁ।—সুভদ্রা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, কিছু না থাকলে কি এ রকম আওয়াজ হয়!—বলতে বলতে আবার বাক্সটিকে নাড়া দিলে সে; আবার সেই টুংটাং মিষ্টি আওয়াজ শোনা গেল।

উপায়ান্তর না দেখেই একটু পরে সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ওতে এক জোড়া বালা আছে।

বালা!—সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কিসের বালা?

ঢোক গিলে সুবোধ উত্তর দিলে, সোনার।

সুভদ্রার দুই চোখের সকৌতুক দৃষ্টি অকস্মাৎ অসাধারণ রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে; তার পর হেঁট হয়ে বাক্সটিকে সে খুলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অনেক টানাটানি ক'রেও ডালাটাকে নাড়াতে না পেরে আবার সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, চাবি আছে? দিন তো।

হাতের পেয়ালাটা মুখের কাছ থেকে পিরিচের উপর নামিয়ে রাখলে সুবোধ; ছলাৎ ক'রে খানিকটা চা টেবিলের উপর প'ড়ে গেল; অত্যন্ত বিব্রত ভাবে সে বললে, চাবি দিয়ে কি করবেন আপনি?

বাক্সটা খুলে বালাজোড়া একবার দেখব।—সুভদ্রা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে; কিন্তু তার পরেই হেসে ফেলে সে আবার বললে, ভয় নেই, সুবোধবাবু; আপনার বালা কেড়ে নেব না আমি, শুধু একটিবার দেখব।

মুখ লাল ক'রে সুবোধ বললে, কি যে বলেন—তাই আমি বলেছি নাকি?

তবে চাবি দিন।—ব'লে সুভদ্রা সুবোধের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে।

ইচ্ছা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুবোধকে হার মানতে হ'ল।

চাবি দিয়ে বাক্স খুলে সুভদ্রা বালা-জোড়াটি বের করলে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে সেটি পরীক্ষা ক'রে দেখলে সে; কতকটা যেন আপন মনেই সে বললে, খাঁটি সোনা মনে হচ্ছে, কিন্তু পুরোনো জিনিস,—প্যাটার্নটা একেবারেই সেকেলে।

তার পর সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কার বালা, সুবোধবাবু?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আমার মায়ের হাতের বালা।

মায়ের হাতের? সুভদ্রা চমকে উঠল, এবার দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কেন?

জেরায় বিব্রত হয়ে পড়ছিল সুবোধ; কথাটা ঢাকতে গিয়ে ক্রমেই সে উপহাসাস্পদ হয়ে উঠছে দেখে অবশেষে নিজে থেকে সকল কথা একবারেই খুলে বললে সে। কুণ্ঠিত মুখে শুকনো একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে উপসংহারে সে বললে, এবার ঠাকুমা রাগ ক'রে বালা-জোড়া আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, নাত-বউয়ের মুখ দেখা তাঁর অদৃষ্টে যখন লেখা নেই,—এই সব।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার মুখের হাসি নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। সুবোধের কথা শেষ হবার পরেও বালা-জোড়াটি কোলের উপর ফেলে রেখে স্তব্ধ হয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল সে।

দেখে সুবোধ আরও বিব্রত হয়ে পড়ল; বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করবার পর সে বললে, সব তো শুনলেন, এখন জিনিসটি আমার ফিরিয়ে দিন।

কিন্তু সুভদ্রা যেন সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠল; কোলের উপরেই বালা-জোড়াটিকে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে সে বললে, না, না, সব কথা শোনা তো হয় নি! এ কথা আপনি আমায় আগে বলেন নি কেন?

বলবার কোন উপলক্ষও তো হয় নি।—সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে। একটু থেমে এক বার ঢোক গিলে সে আবার বললে, বাড়ি থেকে এসেই জিনিসটাকে ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছিলাম, এই একটু আগে বের ক'রে এনেছি।

কেন?

আমার উপায় নেই, স্নুভদ্রা দেবী। টাকা আমার চাইই—আর আজই চাই। আর তা ছাড়া—

বলতে বলতে সে থেমে গেল; একটু চুপ ক'রে রইল সে; কিন্তু তার পর মুখ তুলে অল্প একটু হেসেই সে আবার বললে, আর তা ছাড়া ও জিনিসের প্রয়োজনও তো আর আমায় নেই!

বোধ করি, ওই হাসি দেখেই স্নুভদ্রা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল; বললে, না-ই বা থাকল। সে জন্যই এমন জিনিস আপনি বেচে ফেলবেন নাকি? না, না, এ আপনি কিছুতেই বেচতে পাবেন না।

কিন্তু আমার যে টাকার দরকার।

দরকার যদি হয় তো আমিই সে টাকা দেব আপনাকে। কিন্তু এ বালা বেচতে পাবেন না আপনি।

স্নুবোধ প্রথম থেকেই বিব্রত হয়ে পড়েছিল; এবার রীতিমত বিহ্বল হয়েই সে বললে, সে কি স্নুভদ্রা দেবী? আপনি টাকা দিতে যাবেন কেন?

স্নুভদ্রা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে না; হঠাৎ তার মুখের চেহারাটাই একেবারে যেন বদলে গেল; কয়েক সেকেণ্ড কাল স্থির দৃষ্টিতে স্নুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে বললে, দৈবদুর্বিপাকে আজ আমি কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি, স্নুবোধবাবু। কিন্তু সে কি আমার এত বড় একটা অপরাধ যে, এ রকম একটা সময়েও দেশের কাজের জন্য নিজের অর্জিত কটা টাকাও আমি আপনাকে দিতে পারব না?

পলকের জন্য বিস্ময়ে স্নুবোধ একেবারে যেন নির্বাক হয়ে গেল; কিন্তু তার পরেই উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বললে, সে কি, স্নুভদ্রা দেবী, সে কথা বলি নি তো আমি! দেশের কাজের জন্য টাকা দেবেন আপনি,—আপনার সে শ্রদ্ধার দান আমি মাথায় ক'রে নেব।

এ মন্তব্যের কোন উত্তর দিলে না স্নুভদ্রা; হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বেশ সহজ ভাবেই সে জিজ্ঞাসা করলে, কত টাকা আপনার চাই?

স্নুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, অন্তত আড়াই শো।

বেশ, তিন শো টাকা আপনাকে আমি এক্ষুনি দিচ্ছি।—ব'লেই স্নুভদ্রা

ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেই হঠাৎ সে সুভদ্রার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে প'ড়ে সেই প্রথম বারের মতই রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, এত কথা আপনি জানেন, সুভদ্রা দেবী! কিন্তু অরুণাংশু, সে-ও কি সব কথা জানে? স-ব কথা?—আপনার এই অবস্থার কথা?

সুভদ্রার চোখ দুটি প্রথমে কুণ্ঠাভরে নত হয়ে পড়ল; কিন্তু পরে হাসতে হাসতেই সে উত্তর দিলে, সে কথা আপনি না-ই বা শুনলেন, সুবোধবাবু। আমাদের দুজনের বোঝাপড়া আমরাই তো ক'রে নিতে পারি। তার খুঁটিনাটি খবর জেনে কি লাভ হবে আপনার?

চুপ।—ব'লে সুভদ্রা হাত তুলে সুবোধকে থামিয়ে দিলে; বাইরের দিকেই চোখ রেখে বললে, কমলা শুনতে পাবে, ওর স্নান হয়ে গিয়েছে।

ফিরে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে গলাটা একটু খাটো ক'রে সে আবার বললে, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তাকে এক দিন তো আপনি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্যের সঙ্গেই উপেক্ষা করেছিলেন। ইদানীং আবার তাই নিয়ে এত মাথা ঘামিয়ে শক্তির অপচয় কেন করছেন?

খোলা দরজা দিয়ে চকিতে বারান্দাটা এক বার দেখে নিয়ে সুবোধ বিহ্বল স্বরে বললে, কিন্তু, সুভদ্রা দেবী, এ যে আমি একেবারেই বুঝতে পারছি নে।

না-ই বা পারলেন।—সুভদ্রা মুচকি হেসে উত্তর দিলে, এই কিছু দিন আগেও তো আমাদের সম্বন্ধটাকে আপনি বলেছিলেন এক দুর্বোধ্য রহস্য। না হয় আজও তা রহস্যই রইল। তার জন্য জগতের গতি তো আর থেমে যাবে না!

এ কথার উত্তর তৎক্ষণাৎ সুবোধের মুখে দূরে থাক্, মনেও এল না। পরে যে কথা তার মনে এল, তাও আর মুখ ফুটে সে বলতে পারলে না।

একটি কটাক্ষ, একটু হাসি, একটি কথার ভঙ্গীতেই সুবোধের মনের ঘড়ির দোলন-কাঁটাটি একেবারে বিপরীত সীমান্তে চ'লে গেল।

করুণা বা সমবেদনা আর নয়, এবার এল নিবিড় বিতৃষ্ণা।

সুভদ্রার মুখের যে হাসিটুকু একটু আগেই সুবোধের মনে এক অস্বস্তিকর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, সেই হাসির আলোকেই এত দিন পর সত্যটাকে সে

যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে। হঠাৎ সে যেন বুঝতে পারলে যে, সুভদ্রা আর অরুণাংশুর সম্বন্ধের মধ্যে রহস্য একটুও নেই, যা আছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট একটা স্থূল কদর্যতা। সুবোধের মনে হ'ল যে, সুভদ্রার কোন দুঃখ নেই, তার জীবনের কোন সমস্যা নেই, সমাধানের কোন প্রয়োজনই নেই ;– অরুণাংশুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, তাদের দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়াও হয়ে গিয়েছে,—বড় লোকের ছেলে আর গরিবের মেয়ের বিবাহ-পূর্ব নির্বন্ধন ভালবাসার সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজের অন্ধকার অন্তঃপুরে যুগ-যুগের আচরিত যে সব বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন আছে, হয়তো তারই কোন একটা পদ্ধতি অনুসারে সুভদ্রাও তার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল সমস্যার সমাধান ক'রে নিয়েছে ব'লেই অরুণাংশুর বিয়ের মত অত বড় গুরুতর ব্যাপারটাকে নিয়েও তার বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা বা উদ্বেগ নেই ; হয়তো সেই জন্যই অননুমোদিত মাতৃত্বের দুর্বহ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েও তাই কথায় কথায় হাসতে আর পরিহাস করতে কোথাও তার একটুও বাধে না।

সুবোধ আলাপ আর চালাতে পারলে না, কমলা ফিরে আসবার পরেও নয়। অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। একটু আগেই তার বুকের মধ্যে যেন একটা ঝড় উঠেছিল, কিন্তু এখন কিছুই নেই। তার মনে হতে লাগল যে, যে বোঝাটা বুকে নিয়ে সুভদ্রার সঙ্গে সে দেখা করতে গিয়েছিল, সেটা নেমে গিয়েছে ; কিন্তু ওই সঙ্গেই তার বুকটাও যেন একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। বেদনা আব নেই, কিন্তু সমবেদনাও অন্তর্হিত হয়েছে ; সুভদ্রার সম্বন্ধে তার দায়বোধেব সম্পূর্ণ অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং সুভদ্রার মূর্তিটিও তার বুকের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ফাঁকা মাঠের মত খালি বুকের মধ্যে হু-হু করা শুকনো বাতাসের মত কেবল একটি মাত্র হাহাকারই যেন দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে,—বৃথা, বৃথাই সুভদ্রার কথা ভেবে নিজে সে অত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ; তার সাহায্য, এমন কি, তার পরামর্শ পর্যন্ত না নিযে সুভদ্রা নিজেই অরুণাংশুর সঙ্গে চলনসই-গোছের একটা রফা ক'রে নিয়েছে !

কিন্তু পায়ে হেঁটে পথ চলতে চলতে তার শরীর ও মনের ওই আচ্ছন্ন অবসন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল। বুকের মধ্যে একটা উল্লাসের

মায়ার জালে আর ধরা পড়বে না সে ; গত ছয় মাসের স্মৃতিকে বিকট একটা দুঃস্বপ্নের মত ঝেড়ে ফেলে নিজে সে তার অতীতের শান্ত সন্ন্যাসের জীবনে ফিরে চ'লে যাবে ; নিরবচ্ছিন্ন রিক্ততার মধ্যে সে দিন যে পরিপূর্ণ মুক্তি সে লাভ করেছে, সকল রকম আসক্তিকে বর্জন ক'রে তার নবলব্ধ ওই মুক্তিকে ভবিষ্যতেও সে অক্ষুণ্ণ রাখবে ;—সুভদ্রা আর অরুণাংশুকে নির্মমভাবে উপেক্ষা ক'রেই এবার জীবনের পথে সে এগিয়ে যাবে ;—পিছনের ডাক শুনে ফিরে যাওয়া দূরে থাক্, পিছনের দিকে একবার ফিরে তাকিয়েও সে শক্তির আর অপচয় করবে না।

হাওড়া স্টেশনে গাড়ির একটা কোণ ঘেঁষে বসল সে। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের গান তার মনে প'ড়ে গেল, 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে'! মন্ত্রের মত ক'রে গানের পদগুলিকে মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে চোখ বুজে এল তার। কখন যে গাড়ি ছাড়ল তা সে জানতেও পারলে না।

ঘণ্টাখানেক পরে গন্তব্যস্থানে এসে গাড়ি থেকে যখন সে নামল, তখন কি যেন এক অনৈসর্গিক প্রেরণায় তার খালি বুক ভ'রে উঠেছে।

সুভদ্রার দেওয়া টাকাগুলি শ্যামাচরণের হাতে তুলে দিয়ে উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, আর ভাবনা নেই, শ্যামাচরণদা ; এবার খুব জোর প্রচার চালাতে থাক। আর মনে থাকে যেন, কখন কি ডাক যে এবার আসবে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে যে ডাক যখনই আসুক না কেন, তখন আমাদের প্রস্তুতির কোন অভাব যেন না থাকে।

৭

১০ই আগস্ট।

ভোরের আলো তখনও ভাল ক'রে ফোটে নি, কারখানায় কাজ শুরু হতেও দেরি আছে। তথাপি ওই অসময়েও শ্যামাচরণ ছুটতে ছুটতে সুবোধের ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। তার হাতে দুখানা খবরের কাগজ।

আগের দিনই গুজব রটেছিল যে, অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা দাবি করবার অপরাধে বোম্বাইতে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে

সময় লাগবে হয়তো। এমন কিছু একটা ভেবে বের করতে হবে যাতে গভর্মেণ্টকে অচল ক'রে দেওয়া যায়।

এতে শ্যামাচরণের ঔৎসুক্য বা উত্তেজনা কোনটাই শান্ত হ'ল না। অস্থির হয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর হঠাৎ সে সুবোধের সম্মুখীন হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, সুবোধবাবু, চুঁচুড়ার কাছারিতে আগুন লাগিয়ে দিলে হয় না? অন্তত কাছের এই থানাটায়?

সুবোধ হেসে ফেললে; বললে, তা হয়, শ্যামাচরণদা; হয়তো এবার অনেক জায়গায় হবেও। তবে আমার মনে হয় কি, জান? একটা বোতাম টিপলেই প্রকাণ্ড একটা কলকে না ভেঙেও যদি অচল ক'রে দেওয়া যায়, তবে সেই বোতামটার সন্ধান যে জানে, সে ওই বোতামই টিপবে, কলটা ভাঙবার জন্য তার সময় আর শক্তির অপচয় করবে না।

রূপক-টা বোধ করি শ্যামাচরণের বোধগম্য হ'ল না; মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে বললে, তবে থাক্ ওসব দাঙ্গা-ফ্যাসাদের কাজ। আপাতত বাজারে একটা হরতাল করিয়ে দিই, কি বলেন?

তা বেশ।—সুবোধ হাসি মুখেই উত্তর দিলে, আমিও ওই হরতাল চাই। তবে কেবল বাজারের হরতাল নয়,—কারখানায় মজদুরের হরতাল। এমন হরতাল যা আগে কখনও হয় নি,—যাতে একটি লোকও কাজে যাবে না যাতে—

খুব হবে, সুবোধবাবু।—শ্যামাচরণ উল্লসিত হয়ে বললে, দেখুন আপনি, আজই আমি হরতাল করিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু সুবোধের ব্যবহারে কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ পেল না; মুখের হাসিটুকু বজায় রেখে শান্ত কণ্ঠে সে বললে, করাতে পার ভালই। কিন্তু আমি যা চাই তা এক দিনের হরতাল নয়। আমি চাই যে, মজদুর এবার কাজ ছেড়ে আসবে নিজের কোন লাভের জন্য নয়, কারখানার উৎপাদন বন্ধ ক'রে, যুদ্ধের মালমসলার সরবরাহ বন্ধ ক'রে সরকারকে অচল করবার জন্য; আর তার চেয়েও বড় কথা, বিদেশী সরকারের মৃত দেহটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সেখানে স্বদেশী সরকারের—স্বরাজের প্রতিষ্ঠার জন্য।

যুগ-যুগের শিক্ষা ও অভ্যাস জাতির মর্মস্থলে আগুনের অক্ষরে যে তত্ত্ব লিখে দিয়েছে, তাই আজ আবালবৃদ্ধবনিতার আচরণের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল। আজ হরতাল। নৈষ্কর্ম্য নয়, আনন্দোচ্ছল অবসর নয়, উচ্ছ্বসিত বিলাপের তামসিক বিলাসোপভোগ নয়, আহত, সংক্ষুব্ধ চিত্তের অন্ধ আক্রোশের উচ্ছৃঙ্খল অভিব্যক্তি নয়,—এ হ'ল ব্রতনিষ্ঠ, দৃঢ়সঙ্কল্প মানবাত্মার শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক সংযমাচরণ; প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্কল্পের, দেশকালবস্তুনিরপেক্ষ উদার ও বিপুল ঐক্যের সুগম্ভীর ঘোষণা। দীনতম ও নগণ্যতম ব্যক্তিও তার গতানুগতিক জীবনের অভ্যস্ত কর্ম বর্জন ক'রে স্বার্থমুক্ত পূত চিত্তে আজ মুক্তি-সাধনার সঙ্কল্প গ্রহণ করবে।

এমনি একটা আদর্শের প্রেরণায় দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ ক'রে ঘরে ফিরে গেল।

কারখানার ভিতরেও চাঞ্চল্য। গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের খবর সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল খবর নয়, ওই সঙ্গে হরতাল করবার জন্য হাতে-লেখা আবেদনপত্রও। মজদুরেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। কাজে আর তাদের মন নেই; কাজেই অমন যে সুদক্ষ তাদের হাত, তাও যেন বিকল হয়ে আসতে লাগল। কল চলতে লাগল বটে, কিন্তু কাজ আর অন্য দিনের মত এগুল না। অনেকে কাজ ফেলে নেতৃবৃন্দের কথা ভাবতে লাগল, আলোচনা করতে লাগল তাদের নিজেদের কর্তব্যের কথা। সর্দারেরা প্রথমে মজদুরদের শাসন করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাও স্রোতের টানে ভেসে গেল। বেশি মাইনের অফিসারেরা অসাধারণ অবস্থা দেখে নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলো চালাবার মোটে সাহসই পেলে না।

সময়মত টিফিনের ছুটির ঘণ্টা বাজল, বৈকাল দুটো থেকে আবার কাজ শুরু হবে। রোজই এমনি হয়,—ঘণ্টা বাজলেই মজদুরেরা কাজ ছেড়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজকের অবস্থা অসাধারণ। আজ হাতের কাজ বন্ধ ক'রে পরস্পরের সঙ্গে তারা কথাবার্তা শুরু ক'রে দিলে। আলোচনার বিষয় মাত্র একটি,—এখন কর্তব্য কি? যারা পরস্পরের অপরিচিত, অথবা পরিচয় থাকলেও সাধারণত যারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না, তারাও আজ সাগ্রহে

পর্যন্ত কেউ আর কারখানায় কাজ করতে আসবে না। খবর শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকবার পর সাহেব টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে নিলে পুলিসের বড় সাহেবকে খবর দেবার জন্য।

যুদ্ধের বাজার। তায় আবার সারা ভারত জুড়ে গণবিদ্রোহের আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে। আত্মরক্ষার চেষ্টায় টলটলায়মান বিজাতীয় সরকারের তৎপরতার অভাব নেই। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই বড় বড় লরিতে চেপে শ-খানেক উর্দি-পরা সশস্ত্র সিপাই কারখানার প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু যাদের নিয়ে কারখানা সেই মজদুরেরা কাজে এল না। ইঞ্জিনের কয়লা অকারণে পুড়ে ছাই হতে লাগল, কিন্তু কল চলল না;—অমন সুসজ্জিত বিরাট কারখানাটি মনে হতে লাগল যেন রূপকথার অভিশপ্ত ঘুমন্ত রাজপুরীর মত খাঁ-খাঁ করছে।

শ্যামাচরণ যখন তার বাসায় ফিরে গেল, তখন দুপুর পার হয়ে গিয়েছে।

তার অবস্থা তখন অনেকটা সম্মোহিতের মত। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র তার মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে; ঘামে এমন ভিজেছে সে যে, দেখলে মনে হয়, এইমাত্র ডুব দিয়ে স্নান ক'রে উঠেছে; ওর উপর আবার তার মুখে ও মাথায় ধুলো লেগেছে বিস্তর; ভীড়ের মধ্যে গায়ের জামা পিঠের কাছে অনেকখানি ছিঁড়ে গিয়েছে; ক্লান্তিতে অমন তার অসুরের মত দেহটাও যেন অবশ হয়ে আসছে।

তথাপি কোন দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কাজ এখনও অনেক বাকি আছে। ছুটোর বাঁশী বাজলেই মজদুরেরা যাতে তাদের সঙ্কল্প ভুলে গিয়ে কাজ করবার জন্য বের হয়ে না পড়ে, সে জন্য বস্তিতে বস্তিতে তাকে সতর্ক হয়ে টহল দিয়ে ফিরতে হবে; অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটকে জিইয়ে রাখবার জন্য অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে অসাধারণ চেষ্টা করতে হবে; যা হয়েছে সে তো কেবল আরম্ভ, শেষ এখনও অনেক দূরে। প্রলোভন আর নির্যাতন দুটোই জয় ক'রে মজদুরেরা যাতে শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্পে অটল থাকতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটি লোককে রীতিমত তালিম দিতে হবে। শ্যামাচরণ তখন কেবল এই সব কথাই ভাবছিল,—নাওয়া-খাওয়ার কথা তার মোটে মনেই ছিল না।

সে বাসায় এসেছিল কতকগুলি ইস্তাহার নিয়ে যাবার জন্য, হেঁটে নয়, ছুটে ; ভেবেছিল যে, বাড়ির কারও সঙ্গে কোন কথা না ব'লে ইস্তাহারগুলো নিয়েই তৎক্ষণাৎ সে আবার ছুটে বের হয়ে যাবে। কিন্তু বাধা পড়ল।

বারান্দায় বেড়ার ঘেরান দেওয়া সঙ্কীর্ণ রান্নার জায়গাটিতে উঠানের দিকে পিছন ফিরে ব'সে সারদা রান্না করছিল ; তার কাছে ব'সে ছিল তাদের ছোট মেয়ে তারা। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে মা ও মেয়ের কথাও চলছিল।

শ্যামাচরণের পায়ের শব্দ শুনেই দুজনেই চমকে ফিরে তাকাল। তারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, ওই বাবা এসেছে।—পরক্ষণেই সে উঠানে ছুটে গিয়ে দু হাত বাড়িয়ে শ্যামাচরণকে জড়িয়ে ধরলে।

শ্যামাচরণ বিব্রত হয়ে বললে, ছাড়্ ছাড়্, এ কি করছিস ?

কিন্তু ছেড়ে দেওয়া দূরে থাক্, পিতাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধ'রে তারা হাসিমুখে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি এত দেরি কেন করলে, বাবা ? চট্ ক'রে নেয়ে নাও, অনেক জিনিস রান্না হয়েছে আজ ; মা অনেক রকম পিঠেও করেছে ; ওই যে সুজির পুর দেওয়া পুলিপিঠে, যা তুমি খুব ভালবাস, তাও তৈরি হয়েছে বিস্তর। এখন পায়েস হচ্ছে। কিন্তু বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার, আমি আর দেরি করতে পারছি নে, চট ক'রে এক্ষুনি তুমি বাড়িতেই নেয়ে নাও, বাবা।'

শ্যামাচরণ প্রথমে চমকে উঠেছিল, কিন্তু তার পর সে যেন পাথর হয়ে গেল। এও কি সম্ভব,—এই এত বড় অধর্মাচরণ। আজ হরতাল, ঘরে ঘরে অরন্ধন আর উপবাসের ব্যবস্থা ; ব্রত আরম্ভের পূর্বে চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে সংযমাচরণের নির্দেশ আছে, আজ তাই তাদের পালন করতে হবে। অথচ আজকের দিনে তার নিজের বাড়িতেই কিনা ভোজের আয়োজন হয়েছে ! কথাটা শ্যামাচরণ প্রথমে যেন বিশ্বাসই করতে পারলে না। কিন্তু মেয়েটি তখনও কলকণ্ঠে ওই ভোজের আয়োজনের কথাই ব'লে যাচ্ছিল। স্তম্ভিত শ্যামাচরণ তার মুখের দিকে চাইতেই দেখতে পেলে, বালিকার চোখ দুটি উৎসাহ ও আনন্দে খঞ্জনের মত নেচে বেড়াচ্ছে ; সারদার মুখের দিকে চেয়েও সে দেখতে পেলে, তারও ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। কিন্তু ওই হাসি দেখেই চক্ষের নিমেষে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন তার মাথায় গিয়ে উঠল;

আচ্ছা, পায়েস তবে নামাও গে তুমি। ততক্ষণে আমিই ওকে স্নান করিয়ে দিই।—ব'লে তারার হাত ধ'রে তখনই শ্যামাচরণ চলবার উপক্রম করলে।

কিন্তু সারদা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল; এক হাঁচকা টানে মেয়েকে স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললে, তুমি ওকে স্নান করাবে কি? কখনও এ সব কাজ করেছ তুমি যে, আজ করতে চাচ্ছ? তার চেয়ে উনোনের ধারেই তুমি একটু ব'স, আমিই চট ক'রে তারাকে নাইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, পায়েসটা ধ'রে যায় না যেন।

শ্যামাচরণের ধৈর্য শেষ হয়ে আসছিল। ওদিকে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েছে, তার দেরি হ'লে একটা অনর্থ ঘটতে পারে। তথাপি সারদার নির্দেশ-মত সে উনোনের ধারে গিয়েই পায়েসের খবরদারি শুরু ক'রে দিলে।

একটু আগেই ছোট্ট যে ঘটনাটি ঘ'টে গেল, তাই তার মনকে বড় জোরে নাড়া দিয়েছে। পাঁচটি মিনিটের মধ্যেই মেয়েকে আজ সে যেমন ক'রে দেখেছে তেমন আগে সে যেন তাকে কোন দিনই দেখে নি। বড় করুণ, বড় মধুর সেই কচি মুখখানি। শীর্ণ, রোগা দেহ, অমার্জিত ময়লা রঙ, মাথার ছোট ছোট বিন্যাসহীন চুলে তৈলহীনতার ধূসর রুক্ষতা। কান খালি, হাত খালি, গায়ে একখানিও অলঙ্কার নেই। পরিচ্ছদের মধ্যে ছেঁড়া ময়লা একটি ছিটের ফ্রক মাত্র। মেয়ের মুখখানি ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ এক সময়ে শ্যামাচরণের মনে হ'ল যে, সারদা সত্য কথাই বলেছে, সত্যই মেয়ের জন্য কোন দিনই কিছুই সে করে নি। তথাপি তার সেই উপেক্ষিতা অবহেলিতা কন্যাটিই তারই সঙ্গে একত্র ব'সে খাবার জন্য এত বেলা পর্যন্ত উপবাসী রয়েছে, তাকে দেখামাত্রই মহা উল্লাসে ছুটে গিয়ে বাড়িতে ভোজের আয়োজনের সংবাদ কলকণ্ঠে তাকে শুনিয়ে দিয়েছে, তার পর তার ব্যবহারে মর্মাহত ও শঙ্কিত হয়ে বহু-আকাঙ্ক্ষিত ভোজটিকেই বর্জন ক'রে তাকেই আবার খুশি করতে চেষ্টা করেছে। ভাবতেই শ্যামাচরণের বুকের ভিতরটা আলোড়িত হয়ে উঠল। সত্যই তো, অবোধ ছোট মেয়েটির আজকের আচরণের মধ্যেই তার বঞ্চিত জীবনের সমস্ত রিক্ততা সে যেন আজ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। নৈরাশ্য আর লাঞ্ছনা ছাড়া বাপের কাছ থেকে জীবনে আর কিছুই সে পায় নি ব'লেই তো

দেখে খুশি হয় নি, পাছে আবার একটা অনর্থ উপস্থিত হয় এই ভেবে মনে মনে সে সন্ত্রস্তও হয়ে উঠেছিল। আর স্বয়ং শ্যামাচরণের লজ্জা ও অস্বস্তির অন্ত ছিল না। অপরাধীর মতই চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর সে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আপনি না হয় যান, সুবোধবাবু; আমি একটু পরেই আসছি।

সুবোধ অন্যমনস্কের মত বললে, না, তার দরকার নেই। আমি এখানেই বসছি। তুমি ওকে খাওয়াও। তার পর দুজনে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

তার পর হেসে ফেলে সে আবার বললে, যা দেখছি আর যার গন্ধ পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে যে, উপোস ক'রে তুমি ঠ'কে গিয়েছ, শ্যামাচরণদা। কি দরকার এমন ঠকবার? মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কিছু খেয়ে নাও না!

উত্তর দিলে সারদা। সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে সে বললে, এ বেলা খাওয়া তো দূরের কথা, বলছে যে, রাত্রেও আজ ওর খাওয়া নেই। হ্যাঁ, সুবোধবাবু, আজকের হরতালে দু বেলাই উপোস করবার ব্যবস্থা নাকি? তাই বলেছেন আপনি?

কই, না তো!—সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, দু বেলা দূরে থাক্, এক বেলা উপোস করতেও তো কাউকে বলি নি আমি।

মুহূর্তের জন্য সারদা যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল; কিন্তু ওর পরেই স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে উদ্ধত স্বরে সে বললে, তবে?

শ্যামাচরণ বিব্রত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু ওই ভাবটা গোপন করবার জন্যই যেন সে-ও উদ্ধত স্বরেই উত্তর দিলে, 'তবে' আবার কি! আমি কি বলেছি যে, সুবোধবাবু আমায় উপোস করতে হুকুম দিয়েছে! আমার খুশি আমি উপোস করছি।

সুবোধ কিছুই বুঝতে না পেরে বিহ্বল স্বরে বললে, কি হয়েছে, বউদি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে!

সারদা চট ক'রে আঁচল দিয়ে চোখের কোণটা মুছে ফেলে গাঢ় স্বরে বললে, হবে আর কি! যা আমার অদৃষ্টে চিরকাল হয়ে এসেছে, তাই। ভোরে উঠে মুন্সিব-বাড়িতে কাজে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়েই শুনলাম সব গোলমালের কথা। কাজে আর মন লাগল না। গিন্নীমাকে বলতেই তিনিও ছুটি দিয়ে

দিলেন। বললেন, তা যাও তুমি, ঝি ; আজ যখন সকলেরই হরতাল, তখন তোমারও কাজ বন্ধ থাকবে বইকি। চ'লে এলাম। পথে আসতে আসতে ছাই-পাঁশ কত কি মনে উঠতে লাগল! ভাবলাম, এই তো গোলমাল শুরু হ'ল, কার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! আজ যখন সময় পাওয়া গিয়েছে, তখন ভালমন্দ দুটি নিজের হাতে রেঁধে ওঁকে আজ খেতে দিই। অথচ বাড়িতে এসে আমায় রাঁধতে দেখেই উনি আমার উপর তম্বি করতে লাগলেন,—হ্যাঁ, আজ হ'ল গিয়ে হরতাল, আজ এ সব কেন, গলায় আটকে যাবে না এ সব জিনিস!—এই সব।

শ্যামাচরণ আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা এতক্ষণ সে তলিয়ে বুঝবার জন্য চেষ্টা করে নি। যে কারণে বাইরে কাজের তাড়া থাকলেও নিজে সে ছোট মেয়েটিকে নিজের হাতে খাওয়াতে বসেছে, ঠিক সেই কারণেই যে সারদা তার জন্য এত যত্নে এত সব খাবার তৈরি করেছে, তা এখন বুঝতে পেরে সারদার কাছেও নিজেকে তার অপরাধী মনে হতে লাগল। কিন্তু প্রকাশ্যে, বিশেষ ক'রে সুবোধের সামনে মুক্তকণ্ঠে নিজের দোষ সে স্বীকার করতে পারলে না ; বরং কুণ্ঠিত ভাবটাকে গোপন করবার জন্যই আগের মত উদ্ধত স্বরেই সে বললে, কেন, অন্যায় কোন্ কথা টা বলেছি আমি? আজ যে হরতাল, দোকান-পাট সব বন্ধ, তা তো নিজেই তুমি জান। তবু কি দরকার ছিল আজই ষোড়শোপচারে এই ভোজের আয়োজন করবার?

সারদা উত্তর দিলে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে ; বললে, শপথ ক'রেই আপনাকে আমি বলতে পারি, বাবু,—হরতাল আমি ভাঙি নি, বাজার থেকে এক পয়সার জিনিসও কিনি নি আমি। ঘরে আমার যা ছিল, তাই দিয়েই যতটুকু সম্ভব আয়োজন করেছি। কেবল দুধটুকু এনেছি গয়লা-বউয়ের কাছ থেকে, আর তা-ও নিজে সে আমায় দিতে চাইলে ব'লে। তার জন্যও দাম আজ দিই নি। নারকেলটি আমার মুনিব ঠাকরুণ নিজে যেচে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, সুবোধবাবু, এতে কি আমার দোষ হয়েছে?

শুনতে শুনতে সুবোধ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু শেষের প্রশ্ন

দিয়ে পরে সে বললে, এই দিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে তুমি বায়স্কোপের ছবি দেখো ; কিন্তু আজ নয়, কাল।

তারা উল্লসিত হয়ে বললে, সে বেশ মজা হবে, বাবা, কিন্তু তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে—হ্যাঁ, যেতেই হবে তোমাকে, নইলে যাব না তো আমি—কক্ষনো না।

শ্যামাচরণ হেসে ফেলে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, সে কাল দেখা যাবে 'খন। এখন তুমি একটু বাইরে যাও তো, মা, তোমার মাসীর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে এস। ততক্ষণে তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একটু কথা ব'লে নি।

তারাকে বিদায় ক'রেই শ্যামাচরণ সারদার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কথাটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবার জন্যই ফিরে এলাম। সত্যি ইস্তাহার বাটতে চাও তুমি ?

ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে সারদা উত্তর দিলে, তাই তো সাধ ছিল, শুধু ইস্তাহার বাটবার কেন, আরও সব কাজ করবার। এমন একটা দিন! কে জানে, জীবনে এ দিন আর আসবে কি না!

কিন্তু সুবোধবাবু যা বললেন,—তোমার কিছু হ'লে তারার কি হবে ?—শ্যামাচরণ বিব্রতের মত প্রশ্ন করলে।

সারদা উত্তরে বললে, তা-ও মোটামুটি ঠিক ক'রেই রেখেছি আমি। দেশে জমিজমা কিছু তো এখনও আমাদের আছে, বাড়ির কাছে তারার মাসীও আছে। তাই ভেবেছিলাম যে, তারাকে তার মাসীর কাছেই না হয় রেখে আসব।

সত্যি!—শ্যামাচরণ উৎফুল্ল হয়ে বললে, সত্যি এ কাজ পারবে তুমি ? এই দেশে গিয়ে, মানে, তারাকে ছেড়ে—

বলতে বলতে বিভ্রান্তের মত থেমে গেল শ্যামাচরণ ; তার পর কুণ্ঠিত ভাবে একটু হেসে সে আবার বললে, মানে, আগে কোন দিনই দেশে তুমি যেতে চাও নি কিনা, তাই কথাটা কেমন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

সারদার মুখেও বিষণ্ণ রকমের একটু হাসি ফুটে উঠল ; উত্তরে মুখ ফিরিয়ে সে বললে, তোমাকে ছাড়বার জন্য ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে যাওয়া আর তোমার সঙ্গে যাবার জন্যই মেয়েকে দেশে রেখে আসার তফাৎ যে কি, তা

খানিকটা বেলা হতেই হান্‌টার সাহেবের লোক গিয়ে বিমলকে সাহেবের আপিসে ডেকে নিয়ে এল।

সাহেবের মেজাজ তখন পঞ্চমে চ'ড়ে গিয়েছে; বিমলকে দেখেই মুখ লাল ক'রে সে বললে, এ সব কি হচ্ছে?

ব্যাপার দেখে বিমল নিজেই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তার সহানুভূতি একটুও নেই; হরতালের ফলে যে কারখানা অচল হয়ে যায়, তা সে কিছুতেই চায় না। অথচ তৎসত্ত্বেও হরতাল হয়েছে; তাকে এবং তার ইউনিয়নকে না জানিয়েই শত-করা প্রায় নিরানব্বই জন মজদুরই হরতাল ক'রে বসেছে। এ জন্য তার নিজেরই লজ্জা এবং ক্ষোভের অবধি ছিল না। কাজেই সাহেবের উদ্ধত কণ্ঠের প্রশ্ন শুনে কুণ্ঠিত স্বরেই সে বললে, আমি ঠিক জানি নে। এ হয়তো গান্ধীজী আর নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ, মজদুরদের উত্তেজিত চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ, এ হয়তো হরতাল।

না।—সাহেব প্রতিবাদ ক'রে বললে, এ হরতালের চেয়ে ঢের গুরুতর ঘটনা, এ ধর্মঘট। যুদ্ধকালে এ জিনিস রীতিমত বিদ্রোহ।

বিমল মুখ নামিয়ে বললে, তা যদি হয়ও, তা হ'লেও এর দায়িত্ব আমাদের নয়। আমরা ধর্মঘট করাই নি।

আলবৎ করিয়েছেন। আমি খবর পেয়েছি যে, ইউনিয়নের নামে ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে, সভা করা হয়েছে, মজদুরদের দস্তুরমত উত্তেজিত করা হয়েছে।

একটু ইতস্তত ক'রে বিমল বললে, তা যদি হয়েও থাকে, তা হ'লেও সে আমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে হয় নি।

তবে কোন্ ইউনিয়ন?

সোজা উত্তরটাকে এড়িয়ে বিমল বললে, আমাদের ইউনিয়ন ছাড়াও অন্য ইউনিয়ন এখানে আছে, তা আপনি জানেন।

টেবিলের উপর জোরে একটা ঘুষি মেরে সাহেব বললে, ও সব এক রকম পাখাওয়ালা পাখি। আমি আপনাদের সব ক'জনকে গ্রেপ্তার করাব।

বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল; কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠেই সে

বিমল মুখ ভার ক'রে অভিযোগের স্বরে বললে, আপনি অনেক দিন এ দিকে না আসাতেই এ রকম হ'ল। আপনি থাকলে সুবোধদার কথায় ওরা হরতাল করে কখনও!

অরুণাংশু লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, এলাহাবাদ গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম কিনা! নইলে কি আর এখানে না আসি! গরজ আমার নিজের ব'লেই তো কংগ্রেসের প্রস্তাব পাস হতে না হতেই এখানে ছুটে এসেছি।

কিন্তু তার পর মুখ তুলে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সে আবার বললে, তবে তোমার কথাও সবটা ঠিক নয়, বিমল। লজ্জা ঢাকবার জন্য নিজের কাছে নিজের দাম আমি বাড়াতে চাই নে। আমি এখানে থাকলেও হয়তো এ হরতাল আমি বন্ধ করতে পারতাম না। এ তো কেবল সুবোধের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতাই নয়,—এ প্রতিযোগিতা কংগ্রেসের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির। এর প্রথম খেলায় কংগ্রেস যে জিতে গিয়েছে, এই সত্য কথাটা অন্তত নিজেদের মধ্যে আমাদের মেনে নেওয়াই উচিত।

বিমলের মুখ ম্লান হয়ে গেল। কথাটা সত্য, সে নিজেও তা বুঝতে পেরেছে। তবু এত বড় একটা পরাজয় মেনে নেওয়া খুব সোজা নয়।

তার মনের ভাবটা আন্দাজ ক'রে নিলে অরুণাংশু; হাতের খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে ব'সে সে বললে, তুমি ভেবো না, বিমল; এই পরাজয়কেই আমি বিজয়ে পরিণত করব। ধর্মঘট আমি অবশ্যই ভাঙব, কিন্তু ধর্মঘট করাবার যে কৃতিত্ব সেটাও ছাড়ব না।

বিমল চমকে উঠে বললে, কিন্তু আমি যে সাহেবকে ব'লে এলাম—ধর্মঘট আমরা করাই নি!

তাতে কোনই দোষ হয় নি।—অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, কর্তৃপক্ষের কাছে সেই কথাই আমাদের বলতে হবে। কিন্তু জনসাধারণের কাছে, মজদুরের কাছে কোন মতেই সে কথা আমরা স্বীকার করব না।

বিমল বিহ্বলের মত অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে অরুণাংশুই অল্প একটু হেসে আবার বললে, কথাটা বুঝতে পারছ না? ধর্মঘট আমরা করাব না নিশ্চয়ই; কিন্তু তাই ব'লে আমরা ছাড়া আর কেউ মজদুরকে দিয়ে

এ বারও অরুণাংশু কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রেই উত্তর দিলে, আপনার সশস্ত্র শক্তির সমাবেশ এখানে তো নিতান্ত কম হয়েছে ব'লে মনে হয় না! এ কি কেবলই দেখাবার জিনিস, সাহেব? আপনার বন্দুকধারী সিপাইরা কি গুলি ছুঁড়তে জানে না?

পুলিস সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে হান্‌টার সাহেবেরও মুখ লাল হয়ে উঠল। দুজনের কেউ কোন উত্তর দিলে না। একটু পরে অরুণাংশুই আবার বললে, শুধু সভা আর মিছিল করবার অনুমতি নয়, মিঃ হান্‌টার, মজদুরের মাগ্‌গী ভাতাও বাড়িয়ে দিতে হবে।

সাহেব চমকে উঠে বললে, কিন্তু, মিঃ সেনগুপ্ত, আমরা তো মাগ্‌গী ভাতা দিয়েছি, আর আর কোম্পানির চেয়ে বরং বেশিই দিয়েছি!

অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, কিন্তু তার পর হাওড়ার পোলের তল দিয়ে কত জল ব'য়ে গিয়েছে, তা তো আপনার অজানা থাকবার কথা নয়, সাহেব! জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, সেই হারে ভাতা বাড়াবার জন্য এর মধ্যে ইউনিয়ন থেকে কত বার আমরা দরখাস্ত করেছি, তা-ও কি এখন আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

হান্‌টার সাহেব এতক্ষণ বিহ্বলের মত কথা বলছিল, এ বার বিরক্ত হয়ে বললে, আপনি নিতান্তই অবান্তর কথার অবতারণা করছেন, মিঃ সেনগুপ্ত। মাগ্‌গী ভাতার জন্য তো মজদুরেরা হরতাল করে নি, করেছে সরকারকে অচল করতে।

অরুণাংশু এমন ভাবে সাহেবের চোখের দিকে তাকাল যেন তাকে সে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে; ঠিক ওই ভাবে চোখের দিকে চেয়েই সে বললে, কিন্তু ধর্মঘট তো করেছে! আর সেই ধর্মঘট আপনি ভাঙতে তো চাচ্ছেন! সে কি কেবল মুখের কথাতেই হবে, সাহেব? একেবারেই কি কোন দাম দিতে হবে না? আর দামের কথা যদি ছেড়েও দেন, যারা কাজ ছেড়ে চ'লে এসেছে, তাদের কাজে ফিরে যাবার জন্য সঙ্গত একটা উপলক্ষ্য দিতে হবে তো!

কিন্তু তা আমি কেমন ক'রে দেব?—সাহেব আরও বিরক্ত হয়ে বললে, গান্ধীকে ছেড়ে দেওয়া বা জাতীয় সরকার গঠন করার অধিকার তো আমার নেই।

নেই ব'লেই মাগ্‌গী ভাতা আপনাকে বাড়িয়ে দিতে বলছি।—অরুণাংশু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে।

তার পর সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসতে হাসতে সে আবার বললে, সহযোগিতা কি এক তরফা হয়, সাহেব? আপনি আমাদের সাহায্য না করলে আমরা কেমন ক'রে আপনাকে সাহায্য করব?

দুই সাহেবের মধ্যে একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। তার পর হান্‌টার সাহেব অরুণাংশুকে বললে, আপনাকে একটু বসতে হবে, মিঃ সেনগুপ্ত। আমাদের দুজনের এক বার গোপনে আলাপ করা দরকার।

আধ ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে পুলিস সাহেব বললে, সভা আপনি ডাকতে পারেন, মিঃ সেনগুপ্ত; কিন্তু সভা হবে ধর্মঘট ভাঙবার জন্য। তার ব্যতিক্রম যদি হয়, তবে সভাক্ষেত্রেই আপনাকে তার ফল ভোগ করতে হবে। আমার লোক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওখানে মজুত থাকবে।

পলকের জন্য অরুণাংশু একটু যেন ইতস্তত করলে; কিন্তু তার পর হেসে ফেলেই সে বললে, তা বেশ। কিন্তু মাগ্‌গী ভাতা? তা বাড়িয়ে দেবেন তো?

হান্‌টার সাহেব গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, তা দেব। কিন্তু সে হবে ধর্মঘট ভাঙবার পর, আগে নয়।

সে তো টাকা।—অরুণাংশু মুচকি হেসে বললে, কিন্তু ভাতা বাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি আপনাকে আগেই দিতে হবে।

এবার হান্‌টার সাহেবের ঠোঁটের কোণেও অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল; বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সে বললে, প্রতিশ্রুতি কাকে দেব, মিঃ সেনগুপ্ত? ভাতা যারা পাবে, তারা তো ধর্মঘট ক'রে ব'সে রয়েছে। আর আপনাদের আমি প্রতিশ্রুতি দেব কোন্ ভরসায়? আপনারাই যে মজদুরদের সত্যিকারের প্রতিনিধি, তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তো এখনও আমি পাই নি!

অরুণাংশুর মুখ লাল হয়ে উঠল; ভুরু কুঁচকে সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, প্রমাণ যদি আমি দিতে পারি, সাহেব? মাগ্‌গী ভাতা দাবি করবার জন্য এই তিন হাজার মজদুরকে যদি আমি আপনার বাংলোয় নিয়ে হাজির করতে পারি?

তা হ'লে অবশ্যই ভাতা বাড়িয়ে দেব।—সাহেব তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।

খোঁজে। কিন্তু তার দেখা সে পায় নি। তাতেই সে উভয়সঙ্কটের মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিল। সভা করবার কোন কথাই ছিল না; বরং নাম-করা সব ক'জন কর্মীর প্রতিই নির্দেশ ছিল যথাসম্ভব গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার। কিন্তু নিজে সে না গেলেও যে সভা অবশ্যই হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দল যার ভিতর দিয়ে নিজেদের মতলব হাসিল ক'রে নেবে, সেই সভাকে একেবারে উপেক্ষা ক'রে ঘরের মধ্যে সে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে নি।

সভায় গিয়েই সে বুঝতে পারলে যে, তার আশঙ্কা অমূলক নয়, মজুরদের অধিকাংশকেই কম্যুনিস্টরা জয় ক'রে নিয়েছে।

ঠিক জয় করা নয়, ভুলিয়ে নেওয়া। অবস্থা দেখে প্রথম দিকে শ্যামাচরণ এমনি বিহ্বল হয়ে পড়ল যে, করবার মত কিছু সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

সুবোধবাবু কই—সুবোধবাবু?

জনতার ভিতর থেকে কে এক জন ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করলে। দু-তিন জায়গায় ওই জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনিও বেজে উঠল। কিন্তু ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দুইই চাপা প'ড়ে গেল তুমুল জয়ধ্বনির নীচে,—লাল ঝাণ্ডাকী জয়!

জিগির আর শেষ হয় না। মঞ্চের উপর থেকে বিমলের এক জন সহচর ক্রমাগত জিগির দিয়ে যাচ্ছে, আর জনতা তুলছে তার প্রতিধ্বনি। এই জয়ধ্বনির মধ্যেই পিছন থেকে মঞ্চের উপর উঠে এল অরুণাংশু। তার পরনে খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি; মাথায় দুধের মত সাদা গান্ধী-টুপি। দু হাত জোড় ক'রে, মাথাটা একটু নামিয়ে জনতাকে সে অভিবাদন জানালে। পিছন থেকে তারই এক জন অনুচর ব'লে উঠল, অরুণাংশুবাবুকী জয়—

জনতা প্রতিধ্বনির মত বললে, অরুণাংশুবাবুকী জয়।

সে ধ্বনি থামতেই নীচের ভিড়ের ভিতর থেকে কে এক জন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, মহাত্মা গান্ধীকী জয়—

মৌচাকের গায়ে হঠাৎ ঢিল পড়লে যে অবস্থা হয়, সভায় ঠিক সেই রকম একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। মঞ্চের উপর অরুণাংশু আর তার অনুচরেরাও চঞ্চল হয়ে উঠল।

নীচে জনতাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, হাজার তিনেক লোক এক সঙ্গে হাত তুলে, মাথা নেড়ে গর্জন ক'রে উঠল, মহাত্মা গান্ধীকী জয়!

কাজেই ধ্বনি তেমন জমল না। তথাপি বিমল তৃতীয় বার বললে, লাল ঝাণ্ডাকী জয়—

এটা জয়ধ্বনি। এর প্রাণ আছে, সংক্রামিত হবার শক্তি আছে। বিদ্যুতের প্রবাহের মতই ওই ধ্বনি ময়দানের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে ওই বিহ্বল জনতাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুললে। এ বার অধিকাংশ লোকই প্রতিধ্বনি তুলে বললে, লাল ঝাণ্ডাকী জয়!

এর পর আর কোন বাধা রইল না। বিমলের দেওয়া নূতন জিগিরের নীচে মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি তখনকার মত চাপা প'ড়ে গেল।

জিগির থামবার পর শুরু হ'ল বক্তৃতা। অরুণাংশু প্রথম বক্তা। সে হাসিমুখে মাইক্রোফোনের কাছে এগিয়ে গেল। পাকা বক্তা সে। দিব্য সপ্রতিভ ভাব, ঝরঝরে ভাষা, হাজার তিনেক শ্রোতাকে সে যেন মন্ত্রবলে মুগ্ধ ক'রে দিলে। ধর্মঘটের বিরুদ্ধে একটি কথাও সে বললে না; মহাত্মা গান্ধী ও নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের উল্লেখও সে করলে না। তবে ধর্মঘট করার জন্ত মজদুরদের সে অভিনন্দন জানালে; আশ্বাস দিলে যে, সংহতি যদি তাদের ব্যাহত না হয়, সংঘ আর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা যদি তাদের অবিচলিত থাকে, তা হ'লে তাদের বর্তমান অভাব-অভিযোগের প্রতিকার তো হবেই, অদূর-ভবিষ্যতেই তাদের স্বপ্ন ও সাধনাও সার্থক হবে। সুদীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহারে সে ঘোষণা করলে যে, এই সভাতেই সকলের সম্মতি নিয়ে তাদের দাবির ফিরিস্তি তৈরি ক'রে সকলকে নিয়ে মিছিল ক'রে সে যাবে সাহেবের কাছে তাদের সেই দাবি পেশ করতে। বেশ জোর দিয়ে তার বক্তব্য সে শেষ করলে, সাহেব আমাদের দাবি যদি না মেনে নেয়, তবে আমরা কিছুতেই কাজে ফিরে যাব না, দিনের পর দিন আমাদের এই হরতাল চলতে থাকবে।

বক্তৃতার শেষে জয়ধ্বনি উঠল; লোকে হাততালিও দিলে। কিন্তু আগের মত গোটা সভাক্ষেত্রটা এবার কেঁপে উঠল না। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, সবাই এ বার জয়ধ্বনিতে যোগ দেয় নি, হাততালিও দেয় নি। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকের মুখে চোখেই কেমন যেন একটা বিহ্বল ভাব দেখা গেল; দু-তিন জায়গায় ফিসফাস-ফুসফাস ক'রে চাপা একটা আলোচনাও শুরু হয়ে গেল।

এই অবস্থাতেই বক্তৃতা দিতে উঠল মহম্মদ ইদ্রিস। পশ্চিমের মুসলমান

সে। এক দিন নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় সাধারণ কুলি হিসাবে এই করখানায় সে কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু আজ সে অন্যতম সর্দার। এখন যেমন তার টাকা, তেমনি প্রতিপত্তি। এ অঞ্চলে যত গুণ্ডা আছে, সে তাদের অবি-সংবাদিত নেতা। অনেক দিন আগে এই কারখানায় এক হরতালের সময়ে সে তার অনুচরদের নিয়ে কেবল লাঠির সাহায্যেই মৃতপ্রায় হরতালকে অনেক দিন পর্যন্ত জিইয়ে রেখেছিল। সেই থেকেই মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে তার যোগ। আজ সে অরুণাংশুর ইউনিয়নের সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করছে।

অরুণাংশুর নির্দেশমত এই ইদ্রিস মিঞাই মজদুরের দাবি সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করবার জন্য মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বিশাল তার দেহ, যেমনি দীর্ঘ—তেমনি প্রশস্ত! বিরাট গোঁফজোড়া আর ঘন কোঁকড়া চাপদাড়ি মেহেদির রঙে রাঙানো। ওরই মধ্যে ছোট ছোট চোখ দুটি অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতই তীক্ষ্ণ এবং হিংস্র। শালোয়ার, পাঞ্জাবি আর প্রকাণ্ড পাগড়ি পরা তার পাহাড়ের মত বিরাট দেহটির ভারে মঞ্চের টেবিলটি যেন কেঁপে উঠল।

ইদ্রিসের হাতে প্রস্তাবের খসড়া। অরুণাংশুই দাবির ফিরিস্তি তৈরি ক'রে তার হাতে দিয়েছে। মাগ্‌গী ভাতা থেকে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি পর্যন্ত সব ওতে আছে। থেমে থেমে, প্রায় বানান ক'রে ক'রে ইদ্রিস প্রস্তাবটা সকলকে প'ড়ে শোনালে। তার পর শুরু হ'ল তার বক্তৃতা। সে বক্তৃতা কংগ্রেসের প্রতি এক তীব্র আক্রমণ। আগস্ট বিদ্রোহের ব্যাখ্যা সে করলে পঞ্চম বাহিনীর অপকীর্তি হিসাবে। তার পর গলাটা আরও কয়েক পর্দা উঁচুতে চড়িয়ে সে বললে, আমরা মজদুর, আমাদের স্বার্থ আলাদা, জমায়েৎও আলাদা; অন্য কোন জমায়েতের তাঁবেদার আমরা নই; আমরা গরিব, আমরা বুভুক্ষু; আমরা আর কিছু চাই নে, শুধু পেট পুরে খেতে চাই; শুধু—

মিথ্যা কথা।

মাইক্রোফোনের গম্ভীর নির্ঘোষকেও যেন ডুবিয়ে জনতার ভিতর থেকে এক জন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

সে শ্যামাচরণ।

সবাই চমকে উঠল, মাইক্রোফোনের গলাটা হঠাৎ কে যেন টিপে ধরলে;

আওয়াজ, সবই অসাধারণ। তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জনতা হঠাৎ যেন অভিভূত হয়ে পড়ল।

পিছনে বেদীর উপর থেকে কে এক জন জিগিরই দিয়ে উঠল, অরুণাংশু-বাবুকী জয়—

অনেকেই প্রতিধ্বনি তুললে। যারা সাড়া দিলে না, তারা গেল চুপ ক'রে; প্রতিদ্বন্দ্বী কোন জিগির এ বার আর উঠল না।

দেখে অরুণাংশুর উদ্বিগ্ন মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক বার চারদিকে চেয়ে দেখলে সে; হেসে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নামিয়ে সে সম্বর্ধনার উত্তর দিলে; তার পর মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়ে বললে, ভাই-সব, সময় ব'য়ে যাচ্ছে; সকলে মিছিল ক'রে এখনই আমাদের সাহেবের কাছে যেতে হবে, তার পর আরও অনেক কাজ। আজ এমন মিছিল আমাদের হবে, যেমন আগে এখানে কখনও হয় নি। কিন্তু তার আগে প্রস্তাব পাস হওয়া চাই।

প্রস্তাব প'ড়ে শোনালে না সে; হাতের কাগজখানা উড়িয়ে উড়িয়ে সকলকে দেখিয়ে সে আবার বললে, ভাই-সব, এই আমাদের দাবির ফিরিস্তি। আমরা মাগ্‌গী ভাতা চাই। কেউ এখানে আছে, যে তা চায় না? না, কেউ নেই। আমরা আরও সস্তা দামে চাল চাই, আটা চাই, কাপড় চাই। কেউ এখানে আছে, যে তা চায় না? না, কেউ নেই। আমরা—

অরুণাংশুর গলার আওয়াজ ধাপে ধাপে উপরে উঠতে লাগল। জনতা শান্ত হয়ে শুনলে; অনেকেই মাথা নেড়ে, কেউ কেউ মুখের কথায়ও সায় দিতে আরম্ভ করলে। দেখে অরুণাংশুর চোখ-মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একটু থেমে এক বার দম নিয়ে সে দূরের কারখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে আবার বললে, ওই যে কারখানা দেখা যাচ্ছে, ভাই-সব, ও কারখানা কার? ম্যানেজার হান্‌টার সাহেবের নয়, জেম্‌সন টম্‌সন কোম্পানিরও নয়; ও কারখানা আমাদের। আমরা হাত সরিয়ে নিলেই ও কারখানা বন্ধ ক'রে দিতে পারি, আমরা ইচ্ছে করলেই ও কারখানা আবার চালাতেও পারি। দুদিন কারখানা যে বন্ধ রয়েছে, সে কার ইচ্ছায়—সাহেবের?

অরুণাংশুর কপাল আ'র গাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল, পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে চট ক'রে মুখটা এক বার মুছে নিলে সে; এক বার চারদিকে তাকিয়ে দেখলে; তার পর আবার মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, কিন্তু, ভাই-সব, খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে আমাদের। দেশের নেতাদের নামে, স্বরাজের নামে জাপানের অনেক গুপ্তচর আমাদের বিপথে ভুলিয়ে নিতে চাচ্ছে, চাচ্ছে আমাদের মজদুরদের দিয়ে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাধা দেওয়াতে। পঞ্চমবাহিনীর সেই ষড়যন্ত্র আমাদের বিফল করতে হবে—

ব'লে নাটকীয় ধরনে অরুণাংশু থেমে গেল। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যা হ'ল তা তার আশানুরূপ নয় কেউ প্রতিবাদ করলে না বটে, কিন্তু কেউ সায়ও দিলে না। বরং কল্লোলমুখর মহাসমুদ্রের মত অত বড় সভাস্থলটা হঠাৎ যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

আবার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলে অরুণাংশু; তার পর হাতের কাগজখানা সকলকে দেখিয়ে গলার স্বর উঁচু ক'রে সে আবার বললে, ভাই-সব, এই আমাদের দাবি; এর মর্ম সবাই তোমরা শুনেছ; এখন বল তো, এ সব তোমাদের মঞ্জুর?

অল্প কয়েক জন লোক উত্তরে বললে, মঞ্জুর।

গলার স্বর আরও এক পর্দা উঁচুতে চড়িয়ে অরুণাংশু তখন বললে, তবে চল, ভাই, আমাদের এই দাবি পেশ করবার জন্য এক্ষুনি আমরা মিছিল ক'রে যাব কারখানার ম্যানেজারের কাছে। সাহেব যদি আমাদের দাবি মেনে না নেয়, মাগ্‌গী ভাতা যদি বাড়িয়ে না দেয়, তবে কিছুতেই আমরা কাজে ফিরে যাব না। কেমন, এ প্রস্তাবও সকলের মঞ্জুর?

মন্ত্রমুগ্ধের মত অনেকেই উত্তর দিলে, মঞ্জুর।

তবে চল, ভাই-সব।—হাতের কাগজখানি আকাশে উড়িয়ে অরুণাংশু বললে, এগিয়ে চল। তোমরা সবাই যদি আমার পিছনে থাক, তবে এর প্রত্যেকটি দাবিই আমি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নিতে পারব।

বেদীর উপর বিমল এবং আরও কয়েক জন লোক লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে

প্রতিদ্বন্দ্বী জিগির উঠতে লাগল। সভার দু-এক জায়গায় এক-একটা খণ্ডযুদ্ধও শুরু হয়ে গেল।

দেখে অরুণাংশুর মত লোকও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকবার পর সে হঠাৎ বিমলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, আর এক মিনিটও দেরি করা নয়, বিমল। সবাই আমাদের সঙ্গে হয়তো যাবে না; কিন্তু যারা যাবে, দেরি করলে তাদেরও হয়তো আর পাব না আমরা।

হাতের ঝাণ্ডাটা আস্ফালন করতে করতে জনতার দিকে চেয়ে সে আবার বললে, এগিয়ে চল, ভাই, সবাইকে যেতে হবে সাহেবের বাংলোয়। আমাদের দাবি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় না ক'রে সেখান থেকে কেউ আমরা ঘরে ফিরব না। চল, ভাই, এগিয়ে চল।

হাতের ঝাণ্ডা উঁচু ক'রে বিমলও বললে, চল ভাই, চল; সব চল সাহেবের বাংলোয়। বলতে বলতে নিজেই সে নীচে লাফিয়ে পড়ল।

মাইক্রোফোনের নিকট থেকে একটু দূরে স'রে গিয়ে অরুণাংশু আর এক জনের কানে কানে বললে, মাইক্রোফোন কেটে দিতে বল, সব ভেঙে দাও। এমন ক'রে নষ্ট কর, যাতে আর কেউ এখানে সভা করতে না পারে।

সভা ততক্ষণে একেবারেই ভেঙে গিয়েছে। একটু পরেই বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত জনতা চারদিকে ছিটকে পড়ল। চলা বা বলা কোনটাতেই শৃঙ্খলা একেবারেই রইল না। অনেক লোক বিমলের অনুসরণ ক'রে কারখানার দিকে চলতে আরম্ভ করলে। অরুণাংশু নিজে ওই মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়েই দু হাতে দুটি পতাকা আস্ফালন করতে করতে সেই এক কথা বার বার ব'লে যেতে লাগল, এগিয়ে চল ভাই, এগিয়ে চল—

মাইক্রোফোন নেই, বক্তৃতামঞ্চ ভেঙে পড়েছে। তক্তপোশের বেদী নির্লজ্জ নগ্নতায় কুৎসিত। উপরের শতরঞ্চিখানি স্তূপীকৃত অবস্থায় মাটিতে প'ড়ে আছে। পতাকাগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন। দগ্ধ বনানীর পত্রহীন বৃক্ষকাণ্ডের মত নিরলঙ্কার ধ্বজদণ্ডগুলি হেলে পড়েছে। প্রাচীরপত্রগুলির অধিকাংশই আর নেই। যে দু-একটি আছে, তারা থামের গায়ে বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। হ্যাজের

সে এক অসাধারণ দৃশ্য,—যেমনি করুণ তেমনি বীভৎস !

লোক তো নয়, যেন কাপড়ের একটি পুটুলি। তারই পরনের কাপড় দিয়ে তার হাত দুটি পিছমোড়া ক'রে আর পা-দুটিকে ঘাড়ের সঙ্গে একত্র ক'রে এঁটে বাঁধা হয়েছে। তার মুখও বন্ধ,—কেবল বাইরে থেকেই নয়, মুখের ভিতরেও অনেকখানি কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছে। তার মাথায় কোন একটা জায়গা যেন কেটে গিয়েছে। কপালে, গালে লাল রক্ত জ'মে কালো হয়ে উঠেছে। তবু অজ্ঞান হয় নি লোকটি, হাত-পায়ের বাঁধন ছিঁড়বার জন্য তখনও অনবরত চেষ্টা করছে সে।

দু-তিন জন লোক তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। এক জন ব'লে উঠল, এই তো শ্যামাচরণদা !

সত্যই সে শ্যামাচরণ। হাত-পায়ের বাঁধন অল্প একটু আলগা হতেই সে বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়াল ; পাগলের মত দুই হাত আকাশে তুলে সে চীৎকার ক'রে বললে, ওরা দুশমন, সব ইংরেজের দালাল। আমাদের হরতাল ওরা ভেঙে দিচ্ছে। কিন্তু তা আমরা কিছুতেই হতে দেব না। হরতাল চালাব আমরা, যত দিন স্বরাজ না হয়।

এক জন ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, এ কেমন ক'রে হ'ল, শ্যামাচরণদা, এ দশা তোমার কে করলে ?

শ্যামাচরণ প্রশ্নের উত্তর দিলে না, কাছের লোক কটিকে দূরে ঠেলে দিয়ে সে লাফিয়ে মঞ্চের উপরে গিয়ে উঠল ; হাত তুলে বললে, বল, ভাই—মহাত্মা গান্ধীকী জয়—

কাছে যারা ছিল, তারা সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুললে। গোলমালে যারা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, তারা সজাগ হয়ে বেদীর দিকে ছুটে এল। যারা কিছুই বুঝতে না পেরে বস্তিতে ফিরবার উপক্রম করেছিল, তারাও জিগির শুনে থমকে দাঁড়াল।

জিগির থামতে না থামতেই শ্যামাচরণ অসহিষ্ণুর মত বললে, জিগির নয়, কেবলই জিগির আর নয়। আজ চাই কাজ। হরতাল চালাতে হবে আমাদের। কেবল আমাদের কারখানায় হরতাল চালানো নয়, কাছাকাছি আর সব কারখানায় হরতাল করাতে হবে। কারখানা, আদালত, পুলিস, ফৌজ, সব

তার পর সে খবরের সেরা খবর শুনেছিল তার প্রতিবেশী অনন্ত মিস্ত্রীর মুখ থেকে। মিস্ত্রী শ্যামাচরণের সাহসের কথা, তার উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা, তার গ্রেপ্তারের কথা, তার কপালের সেই ক্ষতটার কথা,—সব সারদাকে খুলে বলেছিল,—একটু অতিরঞ্জিত ক'রেই বলেছিল। উত্তরে সারদা একটি কথাও বলে নি। কাছে ব'সে তারা তাকে আবোল-তাবোল কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল, তারও কোন উত্তর দেয় নি সে। শুধু মাঝখানে এক বার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তাকে কোলের উপর টেনে এনেই আবার যেন সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কাহিনী শেষ ক'রে অনন্ত মিস্ত্রী কখন যে উঠে গিয়েছিল, বোধ করি সারদা তা জানতেও পারে নি।

পুলিসের জুতার গটগট মসমস শব্দ শুনে হঠাৎ সে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

যারা এল, তারা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। কন্‌স্টেব্‌লদের হাতে বড় বড় লাঠি; দারোগার হাতে হান্‌টার, কোমরে রিভল্‌ভার।

ওই দারোগাই সারদার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলে, সুবোধ ব্যানার্জি এখানে আছে?

সারদার চোখের ঘোর তখনও কাটে নি; সে মাথাটা নেড়ে অস্ফুট স্বরে বললে, কই, না তো!

আলবৎ এখানেই লুকিয়ে আছে সে।—দারোগা এ বার হুঙ্কার দিয়ে বললে, বল্ শীগগির, নইলে—

বাকি কথা-কটি তারার আর্তকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনির নীচে চাপা প'ড়ে গেল।

পুলিস দেখেই তারা ভয় পেয়েছিল; দারোগার ধমক শুনে সে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল।

কিন্তু মেয়ের ওই কান্নার শব্দ কানে যেতেই সারদার আচ্ছন্ন ভাবটা একেবারেই কেটে গেল। বাঘিনীর মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে; গর্জন ক'রে বললে, নইলে কি করবে তুমি?—দারোগার প্রায় মুখের কাছে দু হাত নেড়ে সে আমার বললে, আর কি করবে, শুনি? আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছ তোমরা, মারপিট ক'রে হয়তো মেরেই ফেলেছ। আর আমার কি সর্বনাশ করবে? আর কি ক্ষমতা আছে তোমাদের?

সঙ্গে দেখা ক'রে আলোচনা করা আর কিছু টাকা-পয়সা সংগ্রহ করা। দুপুরের আগেই তার ফিরে আসবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ফিরতে রাত হয়ে গেল। স্টেশনে নেমেই সে হেঁটে চলল কারখানার দিকে।

একে কৃষ্ণপক্ষের রাত, তায় আবার নিষ্প্রদীপের জন্য পথে আলো জ্বলে নি। আকাশের এক কোণে কালো মেঘ ঘন হয়ে জ'মে উঠেছিল। বাতাস নেই, অসহ্য গুমোট। পথে লোকজন বড় একটা ছিল না। যানবাহন ও জনমুখর কলকাতার তুলনায় এই শহরতলিতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর নিস্তব্ধ, নিঝুম ভাব।

কিন্তু ওই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতাকে মন্থন ক'রে হঠাৎ একটা শব্দ উঠল, ধুক ধুক ধুক!

শব্দ আগে থেকেই ছিল, সুবোধের কানে সেটা এল হঠাৎ।

সে চমকে থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ অন্যমনস্কের মত পথ চলছিল সে। চমকে মুখ তুলে তাকাতেই অন্ধকারে নিবিড়তর অন্ধকারের বিরাট একটা স্তূপের মত কারখানাটা তার চোখে পড়ল।

আওয়াজ উঠছিল ওই কারখানার ভিতর থেকে, ওই কারখানারই বিরাট হৃদ্‌যন্ত্রটার অবিরাম গতির একটানা ধুক্ ধুক্ ধুক্। ওই আওয়াজ তার কানে আসতেই সুবোধের নিজের হৃদ্‌যন্ত্রটার গতিই অকস্মাৎ যেন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

কারখানা চলছে? মজদুরেরা কাজে ফিরে গিয়েছে? এও কি সম্ভব? মজদুরদের উৎসাহ সে নিজের চোখেই দেখে গিয়েছে,—অবিসংবাদিত প্রমাণ পেয়েছে তাদের অনমনীয় সঙ্কল্পের। এই তো কয় ঘণ্টার মাত্র ব্যবধান! এরই মধ্যে সে সবই কর্পূরের মত উড়ে যাবে, অতীতকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলে মজদুরেরা কাজে ফিরে যাবে, এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য।

কিন্তু ওই—ধুক ধুক ধুক। এ আওয়াজ সে ভাল ক'রেই চেনে। কারখানা যে চলছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সুবোধ বিহ্বলের মত ডান হাতের দুটি আঙুল দিয়ে কপালের দু দিকের দুটি রগ জোরে টিপে ধরলে। কিন্তু পরক্ষণেই হাত নামিয়ে ছুটে চলল সে বস্তির দিকে

আওয়াজ শুনে নিজেও সে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে প্রায় তেমনি কণ্ঠেই বললে, সুবোধ!

ব'লেই উঠে ছুটে গিয়ে সুবোধের ডান হাতখানা চেপে ধরলে সে; তার পর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার বললে, কি ভাগ্য যে তোমায় পেয়ে গেলাম! কাল থেকে কেবল তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম, সুবোধ। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। কিন্তু এস, চা খাও আগে।—এখানে নয়, চল একেবারে ভিতরে গিয়ে বসি।

বলতে বলতে সুবোধকে এক রকম জোর ক'রেই সে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল; কাছে বসিয়ে পরে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ছিলে তুমি এ দু দিন? এখানে এই কাণ্ড বাধিয়ে—

কথাটা তার শেষ হ'ল না; আবার আগের মতই আর্তকণ্ঠে সুবোধ বললে, হাত ছেড়ে দাও, অরুণাংশু; কাজের সময় এখানে না থেকে দ্বিতীয় বার আমি যে অন্যায় করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত এখনও বাকি আছে আমার—

বলতে বলতে এক হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুবোধ উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু অরুণাংশুও সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে আবার সুবোধের হাত চেপে ধরলে; তার পর তাকে এক রকম জড়িয়ে ধ'রেই সে বললে, থাক্, সুবোধ, ও কথাই আজ আর নয়, ওর জন্য তোমায় আমি খুঁজি নি। ব'স তুমি, চা খাও আগে।—বলতে বলতে আরও এক বার এক রকম জোর ক'রেই তাকে সে চেয়ারে বসিয়ে দিলে; তার হাতখানা চেপে ধ'রে রেখেই সে দোকানদারকে উদ্দেশ ক'রে আবার বললে, ওহে, শীগ্‌গির তিন কাপ চা দাও দেখি, আর কখানা বিস্কুট।

চা আসতেই অনেকটা অনুনয়ের মত ক'রেই সে সুবোধকে বললে, চা খাও সুবোধ,—কথা যা আছে তা পরে হবে।

ততক্ষণে সুবোধ কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল; কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই সে চায়ের বাটি কাছে টেনে নিলে, হাতে তুলে চুমুকও দিলে এক বার; কিন্তু পরক্ষণেই বাটিটি আবার পিরিচের উপর নামিয়ে রেখে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললে, এই অভিনয় করতে তোমার লজ্জা করে না, অরুণাংশু?

কোন্‌টা ?—সুবোধ একটু যেন বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে।

অরুণাংশু উত্তরে বললে, কোন্‌টা নয় ? বিদেশী শত্রু যখন দেশের দরজায় এসে হানা দিয়েছে, তখন তোমরা চাচ্ছ দেশের শাসনযন্ত্রটাকে বিকল করতে। দেশরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের ঘাড়ের উপর এসে প'ড়ে থাকলেও শুধু কথায় নয়, কাজেও তাকে তোমরা এড়িয়ে যাচ্ছ ; কোন একটা কার্যক্রম পর্যন্ত ঠিক না ক'রে অজ্ঞ দরিদ্র জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে পথে বের ক'রে নিয়ে এসেছ। এ যে অমার্জনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।

সুবোধ বললে, হয়ও যদি, তবু তা দেশদ্রোহিতার চেয়ে উঁচু স্তরের জিনিস।

অরুণাংশু উত্তেজিত হয়ে বললে, দেশদ্রোহী আমরা নই, তোমরা।

সুবোধ আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উত্তর দিলে, কথাটা যে মিথ্যে তার প্রমাণ আজ আমাদেরই ময়দানে দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী মজদুরের রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছে। তোমাদের কংগ্রেসদ্রোহিতা চরমে উঠেছে আজ।

অরুণাংশু বললে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করলেই তা দেশদ্রোহিতা হয় না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসদ্রোহিতার যে অভিযোগ তুমি করছ, তাও ন্যায্য নয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করি নি।

কর নি ! আমার হরতাল ভেঙে দাও নি তুমি ?

তা নিশ্চয়ই দিয়েছি। কিন্তু তুমি যে হরতাল করিয়েছ, সে যে কংগ্রেসেরও হরতাল তার কোন প্রমাণ দিতে পার তুমি ?

সুবোধ হঠাৎ যেন থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেল। দেখে অরুণাংশুই শব্দ ক'রে হেসে উঠে আবার বললে, তা তুমি পার না, সুবোধ, তোমাদের কংগ্রেসের যারা এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনা করছে, তারা কেউ পারে না। কংগ্রেসের কোন প্রস্তাবে এ রকম কোনও নির্দেশ নেই ; কংগ্রেসের কোন নেতা বা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের নির্বাচিত কর্ণধার গান্ধী-মহারাজও এ রকম কোন নির্দেশ দিয়ে যান নি।

কিন্তু ততক্ষণে সুবোধ নিজেকে সামলে নিয়েছিল ; উত্তরে সে দৃঢ় স্বরেই বললে, তা হ'লেও সব নির্দেশের সেরা নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছেন, অবিলম্বে

পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য প্রত্যেক কংগ্রেসসেবী, প্রত্যেক ভারতবাসীই জীবনপণ ক'রে প্রতিষ্ঠিত বিজাতীয় সরকারকে আক্রমণ করবে।

অরুণাংশুর ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ একটু হাসি ফুটে উঠল; সুবোধের চোখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, সে জন্যই বুঝি যুদ্ধের মাল-মসলা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করছ তুমি?

সুবোধ উত্তরে বললে, হ্যাঁ, ঠিক সেই জন্যই।

সেই জন্যই বুঝি সব জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কাটা হচ্ছে?

হ্যাঁ।

সেই জন্যই বুঝি জায়গায় জায়গায় রেল তুলে, স্টেশন পুড়িয়ে পুলিস-ফৌজের চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে?

হ্যাঁ।

সেই জন্যই বুঝি পোস্ট-আপিস, আদালত, ইউনিয়ন-বোর্ড, মায় ইস্কুল-ঘরও পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে?

হ্যাঁ।

এ সবই হচ্ছে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন?

সত্যাগ্রহ আন্দোলন হোক আর না হোক, কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিশ্চয়ই।

অরুণাংশু এবার শব্দ ক'রে হেসে উঠল; হাসির ফাঁকে ফাঁকেই সে বললে, বলিহারি তোমার কংগ্রেসকে, আর তার চেয়েও বেশি বলিহারি তোমাদের কংগ্রেসের চার-আনার সদস্য না হয়েও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা গান্ধী-মহারাজকে। ঠিক ঝোপ বুঝেই কোপ দিয়েছেন তিনি। এমন চমৎকার সময়ে এমন চমৎকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছেন তিনি যে, মানুষের ইতিহাসের কোথাও এ রকম স্ট্রাটেজির নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফ্যাশিস্তবাদ আর ফ্যাশিস্ত জাপানকে নিন্দা করা হয়েছে, আবার ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে অসহযোগ আর ভারতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করা হয়েছে। জনসাধারণকে বলা হয়েছে, প্রাণ দিয়েও প্রতিষ্ঠিত সরকারকে একেবারে অচল ক'রে দিতে, অথচ কি যে তারা করবে, তার কোন নির্দেশও দেওয়া হয় নি।

বাইরে তখন টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, অন্ধকার মনে হচ্ছে যেন আরও বেশি কালো। হঠাৎ আলোকিত ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে অরুণাংশু কিছুই দেখতে পেলে না।

প্রায় পাগলের মতই সে ডাকলে, সুবোধ, সুবোধ—

তার পর অনেক দূরে অপসৃয়মান একটা ছায়ামূর্তির মত দেখতে পেয়ে সে ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলে।

সত্যই সে সুবোধ, শ্যামাচরণের বাসার দিকে ছুটে চলেছিল সে। অরুণাংশু তার হাত চেপে ধ'রে সনির্বন্ধ স্বরে বললে, আমায় মাফ কর, সুবোধ,—রাজনীতির কথা আর একটাও বলব না আমি, ওটা তুলবার ইচ্ছেই ছিল না আমার। তোমার সঙ্গে অন্য একটা জরুরি কথা আছে। সেটা শেষ না ক'রে যেতে পারবে না তুমি। কিন্তু চল, ওই গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ানো যাক, বৃষ্টি আর বিমলের চোখ—এ দুইই ওখানে এড়ানো যাবে।

অনিচ্ছুক সুবোধকে গাছের নীচে টেনে নিয়ে গিয়েই অরুণাংশু তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সুভদ্রা কোথায়, সুবোধ?

সুবোধ চমকে উঠে বললে, কে?

সুভদ্রা।—অরুণাংশু ঢোঁক গিলে উত্তর দিলে, খবরটা আজ আমায় বলতে হবে। কোথায় আছে সে?

সুবোধের মাথার চুলই কেবল নয়, তার গায়ের সবগুলি লোমও যেন এক সঙ্গে খাড়া হয়ে উঠল। প্রশ্নটা তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, এতক্ষণ যে জগতে সে ছিল সেখানে সুভদ্রার অস্তিত্ব নেই। সেই যে মাসখানেক আগে অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে তার কাছে সে বিদায় নিয়ে এসেছিল, তার পর সুভদ্রার সঙ্গে আর তার মোটে দেখাই হয় নি। ইদানীং তো সুভদ্রার কথা ভাববারও সময় তার ছিল না, তেমন কোন উপলক্ষও উপস্থিত হয় নি। আজ অরুণাংশুকে দেখেও সুভদ্রাকে তার মনে পড়ে নি।

কিন্তু অরুণাংশুর প্রশ্ন শুনবার পর এক সঙ্গেই সকল কথাই তার মনে প'ড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে ও ভিতরে সবই বদলে গেল। এক নিমেষেই সুবোধের মুখখানা হয়ে গেল পাথরের মত কঠিন; চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল

কিন্তু তিনি তো তোমার বিয়ের কথা জানেন।

বিয়ে!—অরুণাংশু হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত হেসে উঠল, তা সে জানতে পারে। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি নে, সুবোধ, জানবার কোন সুযোগই সে আমায় দেয় নি।

মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর; ওতে একটু যেন বিষণ্ণতার আমেজ আছে, কিন্তু নাটকীয়তার কোন আভাসই তাতে নেই। বিস্ময়ে সুবোধ একেবারে নির্বাক হয়ে গেল,—এক মুহূর্তেই তার ভিতরে একটা বিপ্লবও ঘ'টে গেল। তার মুখের চেহারা গেল বদলে; একটি নিমেষের মধ্যেই তার মন দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে কলকাতায় সুভদ্রার ফ্ল্যাটবাড়ির বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। চোখের সামনে সে যাকে স্পষ্ট দেখতে পেলে, সে অরুণাংশু নয়,—সুভদ্রা। তার মনের মধ্যে বিশ্বাসের ভিত্তির গায়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পদ্মার প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের মত প্রবল বিক্রমে সংশয় এসে আঘাত করলে,—সুভদ্রার পাণ্ডুর মুখের উপরকার সে দিনের সেই চটুল হাসি, সে কি তার জমাট অশ্রুর উপরকার সযত্নরচিত আবরণ? সেই হাসি দেখে নিজে যা সে অনুমান করেছিল, সে কি সব ভুল?

মিনিট খানেক উত্তরের জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর অরুণাংশুই হাত বাড়িয়ে সুবোধের একখানি হাত চেপে ধ'রে অনুনয়ের স্বরে বললে, সুবোধ, ভাই, সুভদ্রার ঠিকানাটা আমায় দাও,—তাকে আমার বড্ড দরকার।

সুবোধ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল; তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলে সে; কিন্তু অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বিহ্বল স্বরে সে বললে, তুমি ঠিক বলছ, অরুণাংশু? সুভদ্রা দেবীর কোনও খবর জান না তুমি?

শুকনো রকমের একটু হাসি হেসে অরুণাংশু উত্তর দিলে, জানলে কি আর এত রাত্রে এমন একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করতাম আমি?

তার পরেই হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, আমায় বিশ্বাস কর, সুবোধ, তোমার সঙ্গে সে বার ঘোরতর তর্ক যে দিন হয়, সুভদ্রার সঙ্গেও আমার সে দিনের দেখাই শেষ দেখা। মাঝে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে হঠাৎ এক দিন তার সঙ্গে আমার দেখা অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু সে দিন কথা

ব'লে ফেলেছিল, যে লোকটা ওর এত বড় সর্বনাশ করতে পেরেছে, তাকেই এত ভাল ও বাসল কেমন ক'রে ?

কেবল কমলার মুখের কথাই নয়, মাস কয়েক আগের সেই চিরস্মরণীয় রাতটিতে সুভদ্রার নিজের মুখের যে কথা তার কানে যেতেই তার নিজের মাথার মধ্যে দপ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠেছিল, সেই কথাটাও সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে প'ড়ে গেল ; কিন্তু আমি তো আজও তাকেই ভালবাসি !

কথাটা মনে পড়তেই সুবোধ চমকে উঠল, শেষ রহস্যটুকুও এ বার যেন কেটে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আজও তার মাথার মধ্যে সেই রাত্রের মতই দপ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠলেও সেই আগুনের আলোতেই যেন সত্যটাকে আজ সে স্পষ্ট দেখতে পেলে, আসন্ন মাতৃত্বের সুস্পষ্ট ছাপ-আঁকা সুভদ্রার করুণ পাণ্ডুর মুখখানিই তার চোখের সামনে আরও যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। তার মনে পড়ল যে, সুভদ্রার যে রূপটাকে প্রত্যক্ষ ক'রে কমলা সসম্ভ্রম বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই রূপই বার বার নিজেও সে দেখতে পেয়েছে ; ওরই বাইরের দুর্ভেদ্য বর্মের গায়ে ঠেকে তার নিজের মুগ্ধ চিত্তের অশান্ত কামনা বার বার প্রত্যাহত হয়ে ফিরে এসেছে। নিজের বুকটা তার ব্যথায় টনটন ক'রে উঠলেও ওই অনুভূতির মধ্যেই আরও একটা উপলব্ধি এখন নিবিড় হয়ে জ'মে উঠল, অরুণাংশুর সন্তানই কেবল সুভদ্রার গর্ভে নেই, স্বয়ং অরুণাংশুও আজও সুভদ্রার গোটা হৃদয়টাই জুড়ে ব'সে রয়েছে, এবং রয়েছে ব'লেই অরুণাংশুর বিয়ের খবর জানতে পেরেও তারই সুখ, সন্তুষ্টি আর শান্তির জন্য সুভদ্রা নিজের সকল সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে আর একটি "মিষ্টি মেয়েকে" পথ ছেড়ে দিয়ে শকুন্তলার মত অজ্ঞাতবাসে গিয়ে আত্মগোপন করেছে।

কি ভাবছ সুবোধ ?—উত্তর না পেয়ে অরুণাংশুই আবার জিজ্ঞাসা করলে।

সুবোধ চমকে উঠল, তার সামনে দাঁড়িয়ে অরুণাংশু,—সুভদ্রা নয়। হঠাৎ তার নিষ্প্রভ চোখ দুটি ধকধক ক'রে জ্ব'লে উঠল ; হিংস্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল, অরুণাংশু ; বাজারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তোমায় বেত মারা উচিত।

অরুণাংশুর মুখখানা আবার বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এ বারও ওই মুখখানাই হাসবার মত ক'রে সে বললে, তা হয়তো ঠিক। কিন্তু অতি বড় পাপীরও তো

না-ই করলে। কিন্তু আমার একটা কথা বিশ্বাস কর তুমি,—যা তুমি শুনেছ, যা তুমি ভেবেছ, তার কিছুই ঠিক নয়। তোমার প্রত্যাখ্যানের মতই আমার চাওয়াকেও উপেক্ষা ক'রে সুভদ্রা দেবী আজও তোমারই জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তাকে অবিশ্বাস ক'রে তার এত বড় ভালবাসার অপমান ক'রো না যেন।

একটু থেমে সে আগের চেয়েও গম্ভীর স্বরে আবার বললে, সুভদ্রা দেবীকে হয়তো এ বার আর একা পাবে না তুমি; হয়তো তার কোলেই তার সন্তানকেও দেখতে পাবে, সে সন্তান তোমার।

ব'লেই দ্রুতপদে সে দূরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন রাত অনেক। ব্যারাক এবং বস্তিতে অধিকাংশ লোকই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ময়দান পার হয়ে বস্তির পথ ধ'রে সুবোধ শ্যামাচরণের বাসার দিকে ছুটে চলল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হবার পর যা তার চোখে পড়ল, তাতে তার পা দুটিই কেবল নয়, তার সম্পূর্ণ শরীরটাই যেন পাথর হয়ে গেল। বাড়িতে আলো জ্বলে নি। নক্ষত্রের আলোকে যা দেখা যাচ্ছে, সে যেন বিভীষিকা। হাঁড়ি-কুড়ি, কাঁথা-বালিশ, চারপাই-আসবাব প্রভৃতি গরিবের সংসারের সব সরঞ্জাম উঠানে ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে। বাড়ি আর বাড়ি নেই, মনে হচ্ছে যেন চষা ক্ষেত।

বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সুবোধ ভয়ে ভয়ে ডাকলে, তারা, তারা,—বউদি, ও বউদি—

কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিলে না; কেবল কাছের একটা গাছ থেকে একটা প্যাঁচা বিকট শব্দ ক'রে সুবোধের মাথার উপর দিয়েই কোথায় যেন উড়ে চ'লে গেল।

অরুণাংশু বিমলের কাছে ফিরে যখন এল, তখন তার মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর।

বিমল তাকে দেখেই প্রায় আঁতকে উঠেই বললে, ইস্, অরুণদা, একেবারে যে ভিজে গিয়েছেন দেখছি!

তার পর বিরক্ত কণ্ঠে সে আবার বললে, বুনো হাঁসের পিছনে কেন ছুটতে

গিয়েছিল। দোর খুলতেই তার চোখে পড়েছিল,—ঠিক দোরের সামনেই মাটিতে প'ড়ে সুভদ্রা কাটা ছাগলের মত ছটফট করছে; তার মুখ নীলবর্ণ, চোখের তারা দুটি যেন কোটর থেকে ছুটে বের হয়ে আসছে। কিন্তু ওই অবস্থায়ও কমলার একখানি হাত চেপে ধ'রে কাতর স্বরে সুভদ্রা বলেছিল, আমি তো চললাম, কিন্তু আমার খোকা? তাকে তুমি দেখবে তো, কমলা?

কমলা সুভদ্রাকে ধমক দিয়েছিল, সান্ত্বনাও দিয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয় তার নিতান্ত কম হয় নি,—এত শিগগির এ পরিণতি সে আশা করে নি।

তবে শেষ পর্যন্ত শিশু বা প্রসূতি, কারও কোন অমঙ্গল হয় নি। সুভদ্রার কষ্ট একটু বেশি হ'লেও সে পেয়েছিল ঠিক তাই, যা সে সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিল,—মেয়ে নয়, ছেলে; আকারে একটু ছোট, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাক্তারেরা তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল যে, নবজাত শিশুর দেহের গঠনে অসম্পূর্ণতা থাকলেও তার বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কোন অঙ্গেই মারাত্মক কোন ত্রুটি নেই, বরং প্রকৃতি উদার হয়ে তাকে জীবনের সকল উপকরণ দিয়ে সাজিয়েই সংসারে পাঠিয়েছে।

সুভদ্রার জীবনের সে এক অবিস্মরণীয় দিন। কেবল তার সন্তানের জন্মদিনই তা নয়, সে দিন যেন তার নিজেরও নবজন্মের।

বিশেষ ক'রে সেই সময়টা। হাসপাতালের বিছানার উপর সুভদ্রা অর্ধ-মূর্ছিতের মত প'ড়ে ছিল। কি যে হয়ে গিয়েছে, সে সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না; তেমনি কি যে হবে, সে সম্বন্ধেও নয়। এমনি অবস্থায় হঠাৎ এক সময়ে তার মনে হয়েছিল যে, কে যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে নাম ধ'রে তাকে ডাকছে।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা জানা সুরের মূর্ছনার মত সে আহ্বান তার আচ্ছন্ন মনকে যেন দোলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল।

চোখ মেলেই সে দেখতে পেয়েছিল, তার বিছানার কাছে কমলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কোলে নবজাত শিশু।

কমলা হেসে বলেছিল, কোলে নিবি নে? দেখ্, কি সুন্দর খোকা হয়েছে!

সুভদ্রা তার চোখ বা কান কোনটাকেই বিশ্বাস করতে পারে নি; অভিভূতের মত সে কেবল তাকিয়েই ছিল।

দেখে খুব মিষ্টি রকমের একটা ভ্রূভঙ্গি ক'রে কমলাই আবার বলেছিল, অমন হাবার মত তাকিয়ে রইলি যে? নে।—বলতে বলতে নিজেই সে খোকাকে সুভদ্রার বুকে তুলে দিয়েছিল।

স্থান আর উত্তাপের পরিবর্তন অনুভব ক'রে শিশু তার ছোট শ্বাসযন্ত্র দুটির সবটুকু শক্তি প্রয়োগ ক'রে কেঁদে উঠেছিল।

সে যেন বাঁশীর মত মিহি সুরে অনৈসর্গিক কি এক রাগিণীর অপরিস্ফুট ঝঙ্কার!

সুভদ্রা চমকে উঠেছিল। অতুলনীয় সে দিনের তার সেই অভিজ্ঞতা, অননুভূতপূর্ব সেই মুহূর্তের উপলব্ধি।

সদ্যোজাত শিশুদেহের সুকোমল, উষ্ণ স্পর্শ মুহূর্তমধ্যে যেন সুভদ্রার প্রত্যেকটি লোমকূপের ভিতর দিয়ে অমৃতধারা সঞ্চারিত ক'রে তার বেদনাক্লিষ্ট অবসন্ন দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুকে পর্যন্ত সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছিল। মুখে তখন তার কথা ফোটে নি; কিন্তু তার দুর্বল বাহু দুটি তৎক্ষণাৎ ব্যাকুল আগ্রহে প্রসারিত হয়ে রোরুদ্যমান শিশুকে জড়িয়ে ধরেছিল, আধখোলা নিষ্প্রভ চোখ দুটি হঠাৎ যেন আগুনের মত জ্ব'লে উঠে বিদ্যুদ্বেগে শিশুর মুখের উপর গিয়ে পড়েছিল।

নিজে সে ধাত্রী। অতীতে কত নবজাত শিশুকেই সে বুকে তুলে নিয়েছে, কত শত সদ্যোজাত শিশুদেহের সুকোমল স্পর্শের মধুর স্মৃতি তার বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে জ'মে রয়েছে। কিন্তু ওই বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তটিতে তার মনোজগতে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয় নি,—তার সে দিনের অনুভূতি একেবারেই নূতন।

সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনকুঞ্চিত মুখের উপর সে দিন সুভদ্রার চোখ গিয়ে পড়তেই তার বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন অসীম একটা মহাসাগর গর্জন ক'রে ফুলে এবং দুলে উঠেছিল। হৃদয়ের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা দিয়েই সেই মুহূর্তেই সে নিঃসংশয়ে অনুভব করেছিল যে, কমলা আজ যাকে তার বুকে তুলে দিয়েছে সে তো কেবল নবজাত অসহায় শিশুই নয়, সে যে তার নিজের

তুলে দিয়ে সলজ্জ সহাস্য মুখে কাছে দাঁড়িয়ে সে তার পরিচর্যা দেখতে থাকে ; —এত দিন পর কমলাকে সে বুঝতে পেরেছে।

সুভদ্রার ছেলের সমস্ত দায়িত্বই যেন কমলা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছে। তাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, তেল মাখানো, ঘুম পাড়ানো প্রভৃতি যত রকমের কাজ আছে, তার কোনটাই যেন নিজের হাতে না করলে কমলার তৃপ্তি হয় না। নিজের আহার-নিদ্রা, আরাম-বিশ্রাম সম্বন্ধে তার একেবারেই কোনও খেয়াল নেই। কলের জল বন্ধ হয়ে যায়, তার স্নান করবার সময় হয় না ; রাঁধা ভাত ঢাকার নীচে জুড়িয়ে জল হয়ে যায়, ওদিকে কমলা দোলনা দুলিয়ে ঘুমন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াতে থাকে। সুভদ্রা নাওয়া-খাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করতে গেলে সে রাগের ভান ক'রে দূর দূর ক'রে তাকে তাড়িয়ে দেয় ; কোন দিন আবার ঘুমন্ত শিশুকে আলগোছে চিমটি কেটে জাগিয়ে দিয়ে তাকে দিয়েই নিজের বিলম্বের সমর্থন করিয়ে নেয়।

খোকাকে ফেলে কমলা বাইরে যেতে চায় না। খুব দরকার পড়লে বাধ্য হয়ে যদি তাকে বাইরে যেতে হয়, তা হ'লেও বেশিক্ষণ সে বাইরে থাকতে পারে না, হয়তো কাজ ফেলেই সে বাসায় ফিরে আসে। বাইরে গেলেই ফিরবার সময় খোকার জন্য হয়তো একটা জামা, না হয় এক টুকরা ছিটের কাপড়, না হয় একটা শিশুর খাদ্য, নয়তো কোন রকমের একটা খেলনা সে অবশ্যই কিনে নিয়ে আসে। দিনের বেলায় যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ কিছুতেই সে খোকাকে চোখের আড়াল করতে দেয় না। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ওই খোকাকেই সে স্বপ্ন দেখে। প্রায় রাত্রেই একবার জেগে উঠে ঘুমন্ত সুভদ্রার ঘুম ভাঙিয়ে তার ঘরে গিয়ে খোকাকে সে দেখে আসে, —সুভদ্রাকে তার যেন বিশ্বাস হয় না।

একেবারে কচি শিশু,—অন্ধকারের কোলের উপর অপরিস্ফুট উষার আলোর মত জীবনের অস্পষ্ট এক রেখাচিত্র মাত্র। অপরিণত তার দেহ, মাখনের মত নরম মুখখানির গড়নটি পর্যন্ত তখনও স্পষ্ট হয় নি। এখনও কণ্ঠে তার ভাষা নেই, ঠোঁটে হাসিটুকু পর্যন্ত ফোটে নি। মানুষ হয়ে উঠতে এখনও তার অনেক বাকি। আজও সে ব্যক্তিত্বহীন, বৈশিষ্ট্যহীন, জীবন্ত একটি

কেবল ওই দুটি চোখ। অন্যমনস্ক শিল্পীর হাতের অসম্পূর্ণ মূর্তির মত নবনীত কোমল মানবদেহের এক তাল উপাদানের মধ্যে সূর্যকরোজ্জ্বল সরোবরের মত শান্ত ও স্নিগ্ধ দুটি চোখ,—তেমনি নীল, তেমনি গভীর, তেমনি স্বচ্ছ। বিশ্বের সমস্ত বিস্ময় সেই চোখ দুটির মধ্যে যেন পুঞ্জীভূত হয়ে জ'মে রয়েছে; শাশ্বত মানবচিত্তের শত লক্ষ মূক জিজ্ঞাসা অন্তরের অন্ধকার অন্তঃপুর পার হয়ে এসে যেন ওই চোখ দুটির একাগ্র দৃষ্টির মধ্যে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে থেমে গিয়েছে।

মূর্তিমান বিস্ময়ের মত ওই চোখ দুটির দিকে চেয়ে কমলা নিজেও যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সুভদ্রাও চুপ ক'রে রইল, তার পর কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তুমি শুতে যাও, কমলা; আমিই ওকে ঘুম পাড়াচ্ছি।

কমলা চমকে উঠল, যেন চুরি করতে করতে ধরা প'ড়ে গিয়েছে সে। খোকার গালটা ছেড়ে দিয়ে লজ্জিত ভাবে সে একটু দূরে স'রে গেল; তার পর ওই অপ্রতিভ ভাবটা ঢাকবার জন্যই যেন কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ একটা ঝঙ্কার তুলে সে বললে, শুতে যাবার কথা আর কি বলছিস তুই? রাত কি আর আছে যে, শুতে যাব!

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। অবস্থাটা সে সঠিক বুঝতে পারলে না,—ঘরে আলো জ্বলছিল, বাইরেও আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। কমলার দিকে ফিরে তাকিয়ে কি একটা কথা সে বলবার উপক্রম করতেই কমলাই আবার বললে, না, ভাই, শোওয়া আর নয়। আমাকে আজ এক বার বাইরে যেতে হবে, অনেক কাজ রয়েছে। ডাক্তার সেন কি জানি কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, সেখানে এক বার যেতে হবে। তাগাদা করতে যেতে হবে দু জায়গায়। মীরার সঙ্গে বহু দিন দেখা হয় না, সেখানেও একবার—

কিন্তু সে জন্য এত ভোরে বেরুবার কথা কি বলছ তুমি?—সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে, বাইরে এখনও তো অন্ধকার রয়েছে!

কমলা মাথা নেড়ে বললে, ওটা অন্ধকার নয়, মেঘ ক'রে আছে ব'লেই অমন দেখাচ্ছে। তবে তুমি যদি আবার শুতে চাও তো শোও।

মিলে পথে বের হয়ে এল বিজাতীয় আমলাতান্ত্রিক সরকারকে আক্রমণ করতে।

রব উঠল—সরকারকে অচল করতে হবে। আক্রমণ চলল যা কিছু সচল, তারই উপর।

আজ কদিন ধ'রেই সেই আক্রমণ চলেছে। বে-সামরিক জনসাধারণের আবাসভূমি কলকাতা হয়ে উঠেছে যেন রীতিমত একটা রণক্ষেত্র।

পথ দিয়ে ট্রাম-বাস চলে,—ব'য়ে নিয়ে যায় সেই সব কর্মচারীদের, যারা দপ্তরে আদালতে আর থানায় ব'সে সরকারী যন্ত্রটাকে তেল দিয়ে, গতি দিয়ে চালু রাখে। পথ দিয়েই চলে মিলিটারি আর পুলিসের লরি,—জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর উদ্যমকে হত্যা করবার মারণাস্ত্র। এই সত্যটাই জনতা অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছে। তাই আক্রমণ চলেছে, বিশেষ ক'রে ওই পথের উপর,—উদ্দেশ্য সচল সরকারের গতিটাকে পঙ্গু করা। ট্রামগাড়ির তার কেটে দেওয়া হচ্ছে; কাটা তার আবার জোড়া লাগে দেখে চলন্ত গাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে আগুন। পাথরের পথে পরিখা কাটা যায় না; তাই দু-দশ হাত পরে পরেই প্রাচীর তুলে ছোটখাটো এক-একটা যেন দুর্গ তৈরি করা হচ্ছে। অদ্ভুত সব উপকরণ সে সব দুর্গের। ভাঙা ইট, পাথরের কুচি, কাঠের দোকান থেকে তুলে আনা ছোটবড় কাঠের গুড়ি, প্যাকিং বাক্স, উপরে তোলা পথের ধারের ল্যাম্প-পোস্ট আর চিঠির বাক্স, টেলিগ্রাফ, টেলি-ফোন আর ট্রামগাড়ির কাটা তার দিয়ে একত্র বেঁধে তৈরি হচ্ছে এক-একটা প্রাচীর। জাতীয় ফৌজের বিশৃঙ্খল সেনাকে তারা বর্মের মত রক্ষা নাও যদি করতে পারে, বড় বড় মিলিটারি লরিকেও থামিয়ে দিতে তাদের কার্যকারিতা অসীম। পুলিসের পক্ষে ওগুলিকে ভাঙা সোজা হ'লেও জনতার পক্ষে ওসব গড়াও তেমন শক্ত নয়। সে কালের রক্তবীজের মতই ওর এক-একটা দুর্গ-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ থেকে সারি সারি প্রাচীর আবার গ'ড়ে উঠছে।

বড় বড় মোড় আর ছোট ছোট গলির মুখে ছোট-বড় জনতার ভীড়। সে যেন এক-একটা সেনাদল, না-ই বা থাকল তাদের সাজপোশাক বা অস্ত্রশস্ত্র। যে কোন সুশিক্ষিত সৈন্যদলের যা প্রাণ, সেই দুর্জয় সংকল্প, দুর্দম সাহস,

ক্রিয়ার পিছনে চলেছে প্রতিক্রিয়া। ক্লান্তি কোন পক্ষেরই নেই। দিন আর রাতের স্বাভাবিক পার্থক্যও এখন যেন দূর হয়ে গিয়েছে।

জয়ধ্বনির প্রত্যুত্তরে লাঠি চলছে, ঢিলের প্রত্যুত্তরে চলছে গুলি। এক-একটা অবরোধ বা পরিখার কাছে এসে পুলিসের গাড়ি পথ না পেয়ে থেমে যাচ্ছে; দলে দলে সিপাই আর সার্জেণ্ট নেমে পড়ছে; কাছাকাছি যাকেই চোখে পড়ছে তাকেই তারা ধ'রে এনে তার ঘাড়ের কাছে পিস্তল বাগিয়ে ধ'রে তাকে দিয়েই ওই অবরোধ ভাঙিয়ে রাজপথ মুক্ত করিয়ে নিচ্ছে।

শহরের সর্বত্রই একটা অসাধারণ ও অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে। কি যেন একটা অদৃশ্য চুম্বকশক্তির আকর্ষণে স্থানে স্থানে জনতা জ'মে ওঠে, পুলিসের গাড়ি বীরদর্পে রাজপথ কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ছুটে আসে, কোথা থেকে যেন ছোট একটি ঢিল বা বড় জোর একখানা মাত্র ইট ওই গাড়ির উপরে বা কাছে এসে পড়ে, পরক্ষণেই পুলিসের হাতের বন্দুক গুড়ুম্ গুড়ম্ শব্দে গর্জন ক'রে ওঠে। সন্ত্রস্ত জনতা কোলাহল ক'রে ছুটে পালিয়ে যায়, হুঙ্কার দিয়ে গাড়িও চ'লে যায় তার নিজের কাজে। আহতের ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর আর্তনাদ ওই গুরুগম্ভীর নিনাদকে ছাপিয়ে উপরে উঠতে পারে না, কেবল রাজপথের কালো পাথর মানুষের রক্তে স্নান ক'রে ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠতে থাকে।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মতই সন্তর্পণে পা টিপে টিপে রেড-ক্রশ ছাপ-আঁকা অ্যাম্বুলেন্স-গাড়ি হত ও আহতের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

মহানগরীর বুকের উপর যেন মুক্তজটা নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য চলছে।

পথের দিকের খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা গত দুই দিনে অনেক কিছু নিজের চোখেই দেখেছে; বাসার চাকর আর প্রতিবেশীদের মুখেও সে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছে। শহরের খবরের কাগজগুলি কদিন থেকেই বন্ধ। সুতরাং অধিকাংশ সত্যই লোকের মুখে মুখে পল্লবিত ও কল্পনার রঙে অভিরঞ্জিত হয়েই তার কাছে এসেছে। তার নিজের কল্পনাও ওর উপর অন্য রঙ ছড়ায় নি।

কাজেই কমলার মুখে শহরের ওই অস্বাভাবিক অবস্থার উল্লেখমাত্রেই

কমলা বিরক্ত হয়ে বললে, তুমি তো কেবল টাকাটাই দেখছ। কিন্তু আমি দেখছি যে, এই কেসটা হাতে নিলে রাত্রেও আমায় রোগীর বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে। তখন খোকাকে দেখবে কে? তুমি?

কিন্তু আধ ঘণ্টাখানেক পর জলে-ধোওয়া এক সাজি জুঁইফুলের মত সদ্যস্নাত শিশুকে বুকে নিয়ে কমলা যখন স্নানের ঘর থেকে বের হয়ে এল, তখন বিরক্তি আর অপ্রসন্নতার শেষ রেখাটি পর্যন্ত তার মুখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। হাসিমুখে সুভদ্রার কাছে এসে উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, দেখ, দেখ সুভদ্রা, কি সুন্দর!

সুভদ্রা হেসে খোকাকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু কমলা তৎক্ষণাৎ অনেকটা পিছনে স'রে গিয়ে কুটিল কটাক্ষে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে,'ইস্, অমনি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা! কেন? ওর উপর তোর দাবি কিসের? পেটে ধরলেই বুঝি মা হওয়া যায়? ওকে মানুষ করছি তো আমি,—ও তো আমার।

সুভদ্রার সহাস্য মুখখানি আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল; ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সে সায় দিয়ে বললে, ঠিকই তো, আমিও তো সেই কথাই বলি। ওর জন্মের আগেই ওকে তো তোমায়ই দিয়ে রেখেছি আমি।

কমলা উত্তর দিলে না; মুখ নামিয়ে খোকার কপালে আলগোছে একটি চুমো খেয়ে এগিয়ে সুভদ্রার কাছে এসে বললে, নে, তোর ছেলেকে তুই নে। আমি স্নানটা সেরে আসি এই ফাঁকে।

সুভদ্রা হাসিমুখে খোকাকে বুকে তুলে নিলে। কিন্তু বৈকালে চা খাবার পর হঠাৎ সে রীতিমত গম্ভীর হয়েই কমলাকে বললে, ঠাট্টা নয়, কমলা, খোকাকে নেবে তুমি? নিয়ে ছুটি দেবে আমায়?

কথাটা বুঝতে না পেরে কমলা হতবুদ্ধির মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ওই দৃষ্টিটা সইতে না পেরেই যেন সুভদ্রা চোখ নামিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, সত্যি বলছি, ভাই, ছুটি দেবে আমায়? আমার মনটা বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। খোকাকে যদি তুমি রাখ তো আমি এক বার হুগলী যেতে চাই।

চির কালের মত মুক্তি দিয়ে যাও আমায়। মা গো, মা, এমন রাক্ষুসী মানুষ জগতে থাকতে পারে তা যে আগে আমি কল্পনাও করতে পারি নি!

কথা তো নয়, যেন তুবড়ি থেকে আগুনের ফুলকি সব থোকায় থোকায় ছড়িয়ে পড়ছে। সুভদ্রার দিক থেকে কোন সাড়া না এলেও কমলা আপন মনেই বকতে বকতে কিছুক্ষণ পর বাড়ি ছেড়েই চ'লে গেল।

ফিরে এসে সুভদ্রার সঙ্গে ভাল ক'রে সে কথাই বললে না, অন্যান্য দিনের মত খোকাকেও সে তেমন আদর-যত্ন করলে না। পরদিন ভোরে উঠেই সাজগোজ ক'রে সে 'কাজ আছে' ব'লে বাইরে চ'লে গেল। ফিরে এল বেলা দশটার পর।

কিন্তু বাড়িতে ফিরেই সোজা সে সুভদ্রার কাছে চ'লে গেল। সুভদ্রা কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই নিজে থেকেই সে বললে, ডাক্তার সেনের সেই কেস্‌টা আমিই হাতে নিলাম, সুভদ্রা; মীরার সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে কাজ করব। ভেবে দেখলাম যে, অতগুলো টাকা এ দুর্দিনে ছেড়ে দেওয়া মোটেই সমীচীন হবে না।

সুভদ্রা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে কমলার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর হেসে ফেলে বললে, বেশ করেছ, আমিও তো তোমায় নিতেই বলেছিলাম।

আমিও সেই জন্যই নিয়েছি।—কমলা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, কিন্তু তোমার মনে থাকে যেন। বাইরে গাধার খাটুনি খাটবার পর বাসায় এসে আবার তোমার খোকার পরিচর্যা করতে পারব না আমি। ও কাজ এখন থেকে তোমাকেই করতে হবে।

ওটা কথার কথা যে নয়, বোধ করি, তাই প্রমাণ করবার জন্যই খোকার দিকে এক বার চেয়েও দেখলে না সে। কথাটা শেষ ক'রেই গম্ভীর ভাবে সে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

দিন দুই পরের কথা।

বৈকালে সুভদ্রা তাদের বসবার ঘরে ক্যানভাসের চৌকিটার উপর পা গুটিয়ে ব'সে খোকার জন্য একটা পশমের জামা বুনছিল। বাড়িতে আর কেউ ছিল না। কমলা দুপুরে খাওয়ার পরেই সেই টাইফয়েডের রোগীটির পরিচর্যা

মুখের দিকে চেয়ে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে সে আবার বললে, সব কথা তোমায় খুলেই বলব, নইলে আমার স্বীকারোক্তিও তো সম্পূর্ণ হবে না।

থেমে থেমে অরুণাংশু সকল কথাই খুলে বললে, এমন ভাবে বললে যেন অনুতপ্ত অপরাধী বিচারকের কাছে দোষ স্বীকার করছে। অনামিকাকে সে সত্যই ভালবেসেছিল; ভালবেসে তার নিজের জীবনের সকল কথাই, মায় সুভদ্রার কথাও তাকে সে খুলে বলেছিল; দু পক্ষের অভিভাবকেরাই উদ্যোগী হয়ে এ বিয়ের পরিকল্পনা ঠিক করেছিলেন, স্বয়ং অনামিকারও আপত্তি ছিল না। কাজেই এক বিয়ের দিনটা ছাড়া আর সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। অসাধারণ কিছু না ঘটলে এত দিন হিন্দুমতে অনামিকার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েই যেত। কিন্তু তার আগেই মস্ত একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল। মেয়ের নিজের বাড়িতেই তার নিজের আর তার বাপের চোখের সামনে সুভদ্রার সঙ্গে অরুণাংশুর দেখা হয়ে গেল।

সামনের দিকে বেশ একটু ঝুঁকে, ডান হাতের তালুর উপর মুখখানি রেখে সুভদ্রা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অরুণাংশুর গল্প শুনে যাচ্ছিল; প্রতুলবাবুর বাড়ির ঘটনাটা বর্ণনা করতে করতে অরুণাংশু হঠাৎ চুপ ক'রে গেল ব'লেই সুভদ্রা চমকে উঠে বিহ্বল স্বরে বললে, কেন? তাতে কি হ'ল? তাতে বিয়ে ভেঙে গেল কেন?

অরুণাংশু হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত শব্দ ক'রে হেসে উঠল; বললে, ভাঙবে না? অনু তোমায় চিনতে পেরেছিল যে, আর তার মুখ থেকে জানতে পেরেছিলেন তার বাপ। বাস্—আর কি! সম্ভ্রান্ত সমাজের ধার্মিক পিতা তখনই ঠিক ক'রে বসলেন যে, আমার মত চরিত্রহীনের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি দেবেন না।

একটু থেমে সে আবার বললে, তোমার সঙ্গে সে দিন আমার দেখা তো হ'ল সন্ধ্যার একটু আগে। সেই রাত্রেই আমি চরমপত্র পেয়ে গেলাম; আর বাবা-মা এলাহাবাদে ব'সে পেলেন 'তার'।

এর পরেও সুভদ্রা কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত ব'সে রইল; তার পর মৃদু বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, শেষে আমারই জন্য তোমার বিয়ে ভেঙে গেল!

অরুণাংশু ইতিমধ্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সুভদ্রার বিষণ্ণ

কিন্তু তার পর ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে সে। খাড়া শরীরটাকে চৌকির উপর এলিয়ে দিয়ে সে বললে, যাক, তেমন মারাত্মক কিছু তা হ'লে ঘটে নি। তবু ভাল। মা গো মা, কি ভয়ই তুমি আমায় পাইয়ে দিয়েছিলে! সত্যি, আমার জন্যই তোমার বিয়ে যদি ভেঙে যেত, তবে সারা জীবনেও আমার দুঃখ আর অনুতাপ ঘুচত না।

অরুণাংশু নিজেই এবার বিহ্বল হয়ে বললে, কি বলছ তুমি? তোমার জন্য বিয়ে অবশ্য ভাঙে নি, কিন্তু বিয়ে তো সত্যি ভেঙে গিয়েছে।

ছাই ভেঙেছে!—সুভদ্রা কুটিল কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলে, ভিতরের আসল জিনিসটি যখন অক্ষত আর অক্ষুণ্ণ আছে, তখন বাইরের ফাটলটা জোড়া লাগতে খুব বেশি দিন লাগবে না।

তথাপি অরুণাংশু বিহ্বলের মতই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে একটু পরে সুভদ্রাই আবার বললে, দেখ, অনামিকা দেবীকে তো কাছে থেকেই আমি দেখেছি, কি ভালই যে তিনি তোমায় বেসেছেন তা আমি জানি। আর তার বাবাকেও আমি চিনেছি ব'লেই এ কথা জোর ক'রেই বলতে পারি যে, দু দিন আগে হোক আর পরে হোক, ওই মেয়ের মতেই আবার তাঁকে মত দিতে হবে।

একটু থেমে, ঘাড়টা একটু কাৎ ক'রে আবার কুটিল কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে কৌতুকের স্বরে কথাটাকে সে শেষ করলে, তুমি দেখো, মালাচন্দন দিয়ে বরণ করবার জন্য দু দিন পর মিঃ গুপ্ত নিজেই আবার তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাবেন।

অরুণাংশু তখনও বিহ্বলের মত সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু সুভদ্রার শেষের কথাটা তার কানে যেতেই হঠাৎ তার মুখখানা এক বার লাল হয়ে উঠেই পরক্ষণেই একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। সবেগে মাথা নেড়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বললে, না না, সুভদ্রা, ও দিকের কিছুরই আমার আর দরকার নেই। জালের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে ফাঁস লেগে আমি মরতে বসেছিলাম, মুক্তি পেয়ে আমি তো বেঁচে গিয়েছি।

ইস্!—সুভদ্রা আবার ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললে, মুখ দেখেই তা আমি বুঝতে

শোন তুমি। তোমার নিষেধ ছিল ব'লে আগে সুবোধ আমায় কিছুই বলে নি। এ বারও প্রথমে কিছুই বলতে চায় নি সে। তার পর কথায় কথায় আমার বিয়ে হয় নি শুনে পরে বলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে তার হয়ে তোমায় বলতে ব'লে দিয়েছে যে, তোমার মঙ্গলের কথা ভেবেই তোমার নিষেধ সে অমান্য করেছে।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার শরীরটা আবার যেন পাথর হয়ে গেল। দৃষ্টিহীন নিশ্চল চোখ দুটি অরুণাংশুর মুখের উপর বিন্যস্ত ক'রে দোরের পাশেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

দেখে অরুণাংশু আরও বেশি বিব্রত হয়ে পড়ল; আগের চেয়েও কুণ্ঠিত স্বরে সে আবার বললে, সুবোধের দোষ নেই, শুভা, আমার পীড়াপীড়িতেই কথাটা সে খুলে বলেছে।

সুভদ্রা হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল; অস্ফুট স্বরে বললে, তা হবে। তার পরেই গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, তার সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল তোমার? হুগলীতে?

অরুণাংশু ঢোক গিলে উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

এখনও ওখানেই আছেন তিনি?

বোধ হয় না।—অরুণাংশু বেশ একটু ইতস্তত ক'রে বললে, সে দিন অকস্মাৎ তার সঙ্গে আমায় দেখা হয়েছিল। তার পর অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও আর তার দেখা পাই নি। বোধ হয় ওখানে আর সে নেই। পুলিসও তাকে খুঁজছে, কিন্তু পায় নি।

সুভদ্রা আবার চমকে উঠল; আবার আর্তনাদের মত ক'রে সে বললে, পুলিস খুঁজছে? কেন?

চারদিকে সব গোলমাল হচ্ছে কিনা!—অরুণাংশু আবার ঢোক গিলে উত্তর দিলে, আর তা ছাড়া ওখানে মজদুরদের হরতাল হয়েছিল, সুবোধই তাদের দিয়ে হরতাল করিয়েছিল।

হরতাল! সুভদ্রার চোখ দুটি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হরতাল হয়েছে ওখানে? চলছে এখনও?

না।—অরুণাংশু অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলে, দু দিন পরেই সে হরতাল ভেঙে গিয়েছে।

ভেঙে গিয়েছে! কেন ভাঙল?

উত্তরে অরুণাংশু সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়েই বললে, এ সব কথা এখন থাক্, শুভা; আর এক দিন সব কথা তোমায় বুঝিয়ে বলব। আপাতত স্থির হয়ে ব'স তুমি। তোমার সঙ্গে আজ অন্য কথা আছে আমার।

না।—বলতে বলতে সুভদ্রা যেন ভয় পেয়েই এক পা পিছনে স'রে গেল,—আমার সঙ্গে আর কি কথা থাকবে তোমার! হুগলীর কথাই বল তুমি। সুবোধবাবুকে পুলিস খুঁজছে বলছ, কিন্তু শ্যামাচরণদা? সে ভাল আছে তো?

অরুণাংশু আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, শ্যামাচরণদা আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে।

সুভদ্রার বিবর্ণ মুখ এর প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে আরও বেশি বিবর্ণ হয়ে গেল; কিন্তু তার পর আবার তেমনি অকস্মাৎ তার চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তুমি? তুমি এখনও ধরা পড় নি যে?

অরুণাংশু প্রথমে অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে; কিন্তু তার পর মুখ তুলে অল্প একটু হেসেই সে বললে, আমার ধরা পড়বার কথাও তো নয়। যে নীতির বিরুদ্ধে পুলিসের আক্রোশ, সেই মূল নীতিই তো অনেক আগেই আমি বর্জন করেছি। আর সুবোধ-শ্যামাচরণদা যা করতে চাচ্ছে, তার আমি বিরোধী। সে কথা পুলিস জানে। তোমারও তা মনে থাকবারই কথা।

সুভদ্রা আবার চমকে উঠে বললে, তা বটে।

তার পরেই মুখ ফিরিয়ে নিলে সে; অস্ফুট স্বরে আবার বললে, ব'স তুমি, আমি চা আনছি।

ব'লেই দোরের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, পাণ্ডুর মুখের উপর পাউডারের পাতলা একটা প্রলেপ লাগিয়ে আধঘণ্টাখানেক পর সুভদ্রা আবার যখন রান্নাঘরে ঢুকে জলন্ত

না না, শুভা !—অরুণাংশু মাথা নেড়ে প্রতিবাদ ক'রে বললে, সার্থকতা ছিল, খুবই ছিল ; সে দিন আভাসেও যদি এ কথা আমায় জানতে দিতে !

তা হ'লে আমায় আরও একটু বেশি অপমান করতে পারতে তুমি, না ?

সুভদ্রার মৃদু, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠস্বরও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল। ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বজ্রপাত হয়ে গেল। উত্তরটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, ওর প্রত্যুত্তরে একটা কথাও অরুণাংশুর মুখে ফুটল না।

কিন্তু সুভদ্রা নিজে তার মুখের দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসতে হাসতে আবার বললে, তোমার মনে বুঝি বড্ড ক্ষোভ র'য়ে গিয়েছে ? আর মনের সেই ক্ষোভই বুঝি আজ তুমি মেটাতে এসেছ ?

শুকনো জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটি এক বার চেটে নিয়ে অরুণাংশু টেনে টেনে বললে, আমায় এত ছোট তুমি ভাবতে পেরেছ, সুভদ্রা ? সে দিন এ কথা জানতে পারলে আমি তোমায় আরও অপমান করতাম।

কি করতে, শুনি ?—সুভদ্রা এবার শব্দ ক'রেই হেসে উঠে বললে, মানলাম, অস্বীকার তুমি করতে না। কিন্তু তোমার যে বুক থেকে ভালবাসা কর্পূরের মত উড়ে গিয়েছে, সেই বুকেই হতভাগিনীর জন্য করুণার বান ডেকে উঠত তো ? শিক্ষিত পুরুষের কর্তব্যজ্ঞান ঘুম ভেঙে জেগে উঠত তো ? আর তারই অনুপ্রেরণায় পরদিনই রেজিস্ট্রারের কাছে নিয়ে গিয়ে তুমি আমায় যথারীতি বিয়ে করতে। তার পর যে মেয়েকে এক দিন তুমি ভালবেসেছিলে অথচ আর বাস না, তারই প্রতি কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর যা কর্তব্য,—তাই জ্বরের রোগীর কুইনাইন খাওয়ার মত মুখ ক'রে আজীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন ক'রে যেতে ! কিন্তু সে-ও কি সে মেয়েকে অপমান করা নয় ? ভালবাসা আর কর্তব্য পালন করা কি এক ?

অরুণাংশু অভিভূতের মত নির্বাক হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখে সুভদ্রাই আবার বললে, আর কি করতে, শুনি ? আমার অবস্থার কথা জানতে পারলেই তোমার মরা প্রেম প্রাণ পেয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠত না কি ? দোহাই তোমার, অত বড় একটা অসম্ভব কথা অন্তত তুমি আমায় বিশ্বাস করতে ব'লো না।

অরুণাংশু আর সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলে না ; মুখ

ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ একটা দীপ্তি তার চোখ আর ঠোঁটের কোণে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে ফুটে উঠল।

অরুণাংশু যেন ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। বার দুই ঢোঁক গিলে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আমি— মানে, আগে যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, আজ তোমায় আমি ভালবাসি।

সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে; কিন্তু অকম্পিত কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, কিন্তু আমি বাসি নে।

বাস না!—অরুণাংশু আবার রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, তুমি আমায় ভালবাস না?

সুভদ্রা ঘাড় নেড়ে বললে, না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে তাকাল সে; সোজা অরুণাংশুর চোখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সে আবার বললে, ভালবাসলে মুখ বুজে আর এক জনের হাতে তোমায় ছেড়ে দিয়ে আসতাম নাকি? আমি তো দেবী নই, আমি যে এই মাটির পৃথিবীরই রক্তমাংসের মানুষ।

বিহ্বল অরুণাংশুর মুখে এ বার উত্তর দূরে থাক্, অস্ফুট একটা শব্দও ফুটল না।

কিন্তু তার সেই মুখের দিকেই আরও কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর সুভদ্রা আগের মতই টিপে টিপে হাসতে হাসতে আবার বললে, অবাক হয়ে গিয়েছ তুমি? হবারই কথা। অবস্থাটা প্রথম যে দিন বুঝতে পারি, সে দিন আমিও তোমার মতই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শোন তবে, কথাটা খুলেই বলছি।

সত্যই বসবার চৌকিখানাকে সুভদ্রা অরুণাংশুর আরও একটু কাছে সরিয়ে নিয়ে বেশ জেঁকে বসল। তার পর কৌতূহলী শ্রোতার কাছে অভিজ্ঞ কথক যেমন সরস ক'রে গল্প বলে, তেমনি ক'রেই রসিয়ে রসিয়ে সে বললে, সেদিন হুগলীতে তোমার মুখে ও কথা শুনবার পর আমার বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্ব'লে উঠেছিল। খেতে পারি নে, শুতে পারি নে, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি নে—এমনি অবস্থা। জলেই ডুবব, না, গলায় দড়ি দেব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ধীরে ধীরে ভিতরের জ্বলুনিটা ক'মে আসতে লাগল, আর তারই সঙ্গে

তোমায় ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষাও। তখন মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলেই নিজেই তাকে বোঝাতে লাগলাম, যাক্ গে, আমায় ছেড়েই সে যখন বেশি সুখী হয়েছে, তখন তার সুখের কথা ভেবেই আমিও সুখী হব, কেবল ভালবেসেই আমার ভালবাসা সার্থক হবে,—এই সব শেখা কথা আর কি! ঘটনাক্রমে সুবোধবাবু আমার মুখ থেকে সব খবর জানতে পেরে যখন তোমায় সব কথা জানাতে চাইলেন, তখন হঠাৎ আমার মনটা একেবারে বেঁকে বসল। তিনি কত রকম ক'রে বোঝালেন, তাঁর বন্ধু অতি ভদ্রলোক, আমার হক্ আছে, এই সব। কিন্তু কিছুতেই আমার মন সায় দিলে না। তিনি আমার জীবনের ব্যর্থতার ইঙ্গিত করতেই আমি ফণা-ধরা সাপের মত ফোঁস ক'রে উঠে বললাম, যা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি, তাতেই আমার বুক ভ'রে রয়েছে, তাই হবে আমার জীবনের অবশিষ্ট যাত্রাপথের পাথেয়,—যে সব কথা দিয়ে আগে নিজের মনকে বুঝিয়েছিলাম—সেই সব কথা আর কি! সুবোধবাবু চ'লে যাবার পর আমার মনটা যেন আরও শক্ত হয়ে উঠল; শেষে এমন হ'ল যেন কিছুই হয় নি। তোমাকে টেনে আনা দূরে থাক্, খুঁজে বের করবারও আর ইচ্ছে রইল না। তার পর ঘটনাক্রমে সে দিন মিঃ গুপ্তের ওখানে তোমার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। অনামিকা দেবীর বিয়ের কথা আগে যা শুনেছিলাম, তার সঙ্গে তোমার ওই আসাটাকে মিলিয়ে, দুই আর দুয়ে যোগ ক'রে বেশ বুঝতে পারলাম যে, অনামিকা দেবীর সঙ্গে তোমারই বিয়ের পাকা কথা আর আয়োজন ঠিক হয়ে আছে। ওই দু তিন মিনিটের মধ্যেই এ কথাও বুঝলাম যে, ইচ্ছে করলেই সেই দিনই তোমার ওই বিয়ে ভেঙে দিয়ে তোমায় আবার আমি দখল ক'রে নিতে পারি। কিন্তু সে রকম ইচ্ছের আভাস পর্যন্তও মনে এল না। অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে কি আমার মনে হ'ল, জান? ঈর্ষা নয়, দিব্যি ক'রে বলতে পারি আমি, একটুও ঈর্ষা হ'ল না আমার। ব্যথা যা বোধ করলাম তা নিজের জন্য নয়, কেবল ওই অন্ধ মেয়েটির জন্য। আর জান? তোমার জন্য। মাইরি বলছি, তোমার সে দিনের সেই কালো মুখখানা মনে ক'রেই বুকটা আমার যেন ব্যথায় টনটন ক'রে উঠল। তক্ষুনি মন ঠিক হয়ে গেল আমার; ভাবলাম, আমার নিজের যা হবার সে তো

এও সত্য কথা।—সুভদ্রা হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, মানুষ এক নদীতে দু বার স্নান করতে পারে না, এ কথাও কি আজ তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে?

এও যেন কথা নয়, আর একটা নির্মম আঘাত। অরুণাংশুর মাথাটা এ বার একেবারেই গুলিয়ে গেল। কিন্তু ডানা-ভাঙা পাখীর মত অরুণাংশুর বিহ্বল চোখ দুটি ঘুরতে ঘুরতে ঘুমন্ত খোকার দোলার উপর গিয়ে পড়তেই হঠাৎ যেন অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ সুভদ্রার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে আগ্রহের স্বরে সে বললে, থাক্ তবে, ভালবাসার কথারই আর দরকার নেই। এস, অন্য দশ জন সুস্থ, সহজ, বস্তুবাদী, সংসারী লোকের মতই ঘর-সংসার করব আমরা। সেই জন্যই আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমায়।

সুভদ্রা আবার বিব্রত ভাবে মুখ নামিয়ে নিলে, কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ঘর-সংসার কি বলছ? ঘর-সংসারের কোন দরকার নেই আমার।

তোমার বা আমার দরকার না-ও যদি থাকে।—অরুণাংশু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, তা হ'লেও আমাদের সন্তানের জন্য তার দরকার আছে।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বজ্রপাত হয়ে গেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চমকে উঠে সুভদ্রা বললে, কি!

হ্যাঁ, দরকার আছে।—অরুণাংশু উত্তর দিলে, আমাদের সন্তানের জন্য,—আমার সন্তানের জন্য—ঘরসংসারের খুব দরকার আছে আমাদের। খোকার জন্যই আমাদের দুজনের সংসার পাততে হবে।

না, হবে না।—সুভদ্রা হঠাৎ যেন গর্জন ক'রে উঠল। অরুণাংশুর চোখ দুটি ঘুমন্ত শিশুর মুখের উপর গিয়ে পড়েছে দেখেই তার নিজের চোখ দুটি হঠাৎ যেন বাঘের চোখের মতই উজ্জ্বল আর হিংস্র হয়ে উঠল। গলার স্বর আরও এক পরদা উপরে চড়িয়ে সে আবার বললে, তোমার সন্তান কি বলছ তুমি? কে তোমার সন্তান?

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, খোকা তো আমারও সন্তান!

তোমার সন্তান!—সুভদ্রা আবার গর্জন ক'রে বললে, প্রমাণ করতে

ঠিক পুরুষের সুরটি ধরেছ! পিতার কর্তব্য পালন করতে চাও তুমি? অন্নদাতার কর্তব্য? কিন্তু সে যে সত্যযুগের ইতিহাস গো!—যে যুগে পুরুষেরা মেয়েদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে, হাত-পা বেঁধে তাদের চলৎশক্তিহীন ক'রে তার পর অবলা স্ত্রী আর অসহায় সন্তানের প্রতিপালক হবার গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু আমার এই খোকা তো সত্যযুগের দেবীর সন্তান নয়। তার মানুষী মা একাই যে গতর খাটিয়ে তাকে মানুষ ক'রে তুলবার শক্তি রাখে। তুমি তোমার পিতার কর্তব্যটুকু বিশ্ব-জনের চোখের সামনে ঘটা ক'রে সম্পন্ন না করতে পারলে তোমার নিজের অহঙ্কার ঘা খেয়ে মুষড়ে পড়তে পারে; কিন্তু তাতে খোকার যে কোন লোকসান হবে না. এ কথা তুমি ঠিক জেনো।

শুনতে শুনতে অরুণাংশুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, উত্তরে কি একটা কথা বলবার উপক্রম ক'রেও কোন কথাই সে মুখে উচ্চারণ করতে পারলে না। তথাপি ওর ঐ কালো মুখের দিকেই একদৃষ্টি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর সুভদ্রাই হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে আবার বললে, এ সব বাজে কথা কেন বল্ছ তুমি? কান টেনে মাথাটাকে হাত করতে চাও? কিন্তু তা হবে না। জান তো, শেষ অঙ্কের অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পর যবনিকা আর ওঠে না।

শেষের কথাটা শেষ হবার আগেই সুভদ্রা হঠাৎ চমকে উঠল, বাইরে কে যেন বন্ধ দ্বারে কড়া নাড়ছে। কান খাড়া ক'রে কিছুক্ষণ দোরের দিকে চেয়ে থাকবার পর ফিরে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে মৃদু স্বরে বললে, ব'স তুমি, দেখি, কে আবার কড়া নাড়ছে! কিন্তু সাবধান, আর কোন লোকের সামনে কোন বেফাঁস কথা ব'লে ফেলো না যেন,—এইটুকু মাত্র দয়া আজ তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি আমি।

কড়া নেড়েছিল তাদেরই চাকর দাশু; দোর খুলে তাকে দেখেই সুভদ্রার মুখের উদ্বিগ্ন ভাবটা কেটে গেল। রান্নাঘরের কাছেই দাশুর পথ আগলে দাঁড়িয়ে সে বললে, ভালই হয়েছে দাশু যে, তুমি সকাল সকাল ফিরে এসেছ। খোকাকে নিয়ে বড্ড মুশকিলে পড়েছি আমি। বাইরের এক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছি, আর ও থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। ঘরের মধ্যে

অরুণাংশু কি একটা কথা বলবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু সুভদ্রার শেষের কথাটা শুনে নিজেকে সামলে নিলে সে; কয়েক সেকেণ্ড মাটির দিকে তাকিয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, তা হ'লে এখন আমি আসি।

সুভদ্রা চমকে পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াল, অস্ফুট স্বরে বললে, এস।

কিন্তু অরুণাংশু খানিকটা দূর এগিয়ে যেতেই সুভদ্রা ছুটে এসে তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল; তার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, দেখ, তোমায় আমি নিরাশ ক'রে ফিরিয়ে দিচ্ছি, তোমার সঙ্গে কথা বলবারই মুখ নেই আমার। তবু তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষে চাইবার আছে। আমার একটা কথা তুমি রাখবে?

অরুণাংশু অপরিসীম বিস্ময়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি?

সুভদ্রা প্রথমে চোখ নামিয়ে নিলে; কিন্তু তার পর আবার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়েই বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে সে বললে, দেখ, অকূল সাগরে ভাসতে ভাসতে ভাগ্যক্রমে কমলার কাছে এই আশ্রয়টুকু আমি পেয়েছি। তুমি এ বাসার খোঁজ পাবে, তা আমি ভাবি নি। কিন্তু খোঁজ তুমি পেয়েছ ব'লেই তোমায় আমি বলছি, তুমি আবার এখানে এলে আমাকেই এ বাসা ছেড়ে আবার অকূল সাগরে ঝাঁপ দিতে হবে।

অরুণাংশু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ছেড়ে মৃদু স্বরে সে বললে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সুভদ্রা; শুধু এ বাড়িতে কেন, পথে বের হ'লেও কোথাও তুমি আমার ছায়াও আর কোন দিন দেখতে পাবে না।

সুভদ্রা আর কোন কথা না ব'লে পথ ছেড়ে দিলে। কিন্তু অরুণাংশু চলবার উপক্রম ক'রেও থমকে দাঁড়াল; একটু ইতস্তত ক'রে সে আবার বললে, কিন্তু তোমার কাছেও আমার একটা অনুরোধ রইল, শুভা; কোন দিন কোন কারণে আমাকে যদি তোমার দরকার হয় সে দিন অসঙ্কোচে আমায় একটা খবর দিও তুমি। আমার নিজের বাড়ির দোর ভবিষ্যতে তোমার জন্য বরাবরই খোলা থাকবে।

অসহ্য গুমোট। হাওয়া আছে কি নেই বোঝা যায় না। আকাশে

পাঁশুটে রঙের মেঘ ঘন হয়ে জ'মে রয়েছে ; নীচে পৃথিবীর মুখের উপরে তারই কালো ছায়া। ছাদ আর দেয়াল-ঘেরা ফ্ল্যাট-বাড়িতে সুভদ্রার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। অরুণাংশু চ'লে যাবার পরেও জানলার একটা লোহার শিক শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে সুভদ্রা সেখানেই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রায় মিনিট দশেক পর একটি নিশ্বাস ছেড়ে সে আবার তাদের বসবার ঘরেই ফিরে গেল। ঘর খালি, টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে ; অমলেটের টুকরাটি এখন আর চোখে পড়ে না, এক ঝাঁক মাছির কালো পাখার নীচে খাদ্যবস্তুটি ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। দোরের কাছেই সুভদ্রা থমকে দাঁড়াল ; এক বার বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে সে ; তার পর ছুটে গেল খোকার দোলার কাছে।

দোলা খালি ; তার উপর চোখ পড়তেই সে চমকে উঠল। স্বতঃস্ফূর্ত অস্ফুট একটা আর্তনাদ তার মুখ থেকে বের হয়ে এল ; পড়তে পড়তে টেবিলের কোণটা শক্ত ক'রে চেপে ধরলে সে ; কিন্তু পরের মুহূর্তেই তার বিবর্ণ মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; খ'সে-পড়া আঁচলটাকে বাঁ হাতে কোমরের কাছেই চেপে ধ'রে সে ছুটতে ছুটতে ছাদে উঠে গেল। বাইরের দোরটাও যে খোলাই প'ড়ে রইল, তা সে লক্ষ্যই করলে না।

সন্ধ্যার পর ভিজতে ভিজতে বাসায় ফিরে কমলার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। রান্নাঘরে যেন এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন চলছে। চাল, তরকারি আর মসলা ঘরময় ছড়াছড়ি ; একখানা থালায় খোসা-ছাড়ানো গোটা আলুর স্তূপ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠেছে, আর একখানায় ফালি ফালি বেগুন। ঘরের কোণে দাশু কেবল পায়ের আঙুল কাটার উপর ভর দিয়ে ব'সে শিলের উপর উপুড় হয়ে মসলা পিষছে ; সুভদ্রা নিজে এক ডেক'চি মাংসে দুই হাতে মসলা মাখাচ্ছে। মসলা মাখানো তো নয়, যেন কসরৎ। গাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে, উননের আগুনের আভায় তার কালো মুখখানিও মনে হচ্ছে যেন টুকটুকে লাল।

এ কি ব্যাপার, শুভা !—কমলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

ধরা গলায় সুভদ্রা উত্তর দিলে, শরীরটা তেমন ভাল নেই আমার, গা-হাত-পা—

অ্যাঁ !—কমলা চক্ষের পলকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ; সুভদ্রার কপালে হাত দিয়ে সে বললে, এই তো ! কাল পইপই ক'রে অত বারণ করলাম, তবু আগুনতাতে ব'সে,—তার পর অত রাত্রে আবার স্নান ! জ্বরই হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

না, জ্বর নয়।—সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, অমনি শরীরটা ভার ভার হয়েছে।

থাক্।—কমলা ধমক দিয়ে বললে, ডাক্তারী আর তোমায় করতে হবে না। কিছু এখন মুখে দিস নে যেন—এক চা ছাড়া। আর সারা দিন চুপ ক'রে বিছানায় শুয়ে থাকবি। নাওয়া, খাওয়া, চলা, ফেরা—সব আজ বন্ধ।

সে দিন সারাটা দিন সুভদ্রা শুয়েই কাটাল ; রাত্রে কমলার সঙ্গে ভাল ক'রে সে কথাও বললে না। বার বার কপালে হাত দিয়ে, দু-তিন বার থার্মোমিটার লাগিয়ে তবে কমলা নিশ্চিন্ত হ'ল যে, সুভদ্রার জ্বর হয় নি। তথাপি সে দিন তার গেল উপোস। পরের দিন সে খেতে পেলে কেবল পাউরুটি আর দুধ। তৃতীয় দিন শুক্তোর ঝোল আর ভাত খেয়ে সুভদ্রা বললে, অনর্থক তিলকে তুমি তাল করছ, কিচ্ছু হয় নি আমার।

না হ'লেও সাবধান থাকতে হয়।—কমলা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, চার দিকেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে আজকাল। তুমি বিছানায় পড়লে খোকাকে দেখবে কে ? আমি ওদিকে যে রোগী নিয়ে পড়েছি —

পরের দিন সকালের চায়ের সঙ্গেই দুপুরের খাওয়াটা সংক্ষেপে সেরে নিয়ে কমলা সারা দিনের মত বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু খোকা তখনও তারই কোলে, দিই দিই ক'রেও তাকে সে সুভদ্রার কোলে নামিয়ে দিতে পারছিল না। কিছুক্ষণ হাসিমুখে এই দৃশ্য উপভোগ করবার পর সুভদ্রা অবশেষে অনুনয় ক'রে বললে, দাও, কমলা, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কমলা খোকাকে সুভদ্রার কোলে ছেড়ে দেবার আগেই দাশু একখানা চিঠি আর একখানা পিয়ন-বই এনে সুভদ্রার হাতে দিলে।

সরকারী খামের মধ্যে হালকা চিঠি, এসেছে মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল থেকে।

পিয়ন-বইতে সই ক'রে সুভদ্রা চিঠি রাখলে। কিন্তু খাম খুলে চিঠি পড়তে পড়তে তার মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল।

কমলা উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, কার চিঠি লো ?

সুভদ্রার মুখে উত্তর ফুটল না, বরং তার কম্পিত হাত থেকে খোলা চিঠিখানা মাটিতে প'ড়ে গেল।

দেখে কমলার বুকটাও ধড়াস ক'রে উঠল ; তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসে সবটা প'ড়ে ফেললে সে।

সরকারী ভাষায় সংক্ষিপ্ত চিঠি। সুবোধ ব্যানার্জি নামক একজন যুবক গুলির আঘাতে আহত হয়ে দিন কয়েক আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, তার বর্তমান অবস্থা সঙ্কটজনক—বাঁচবার আশা একেবারেই নেই। নিজে সে সুভদ্রা দেবীকে এক বার দেখতে চায় ; এই তার অন্তিম ইচ্ছা মনে ক'রে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সুভদ্রা দেবীকে এই সংবাদ জানিয়ে দিলেন।

পড়তে পড়তে কমলার মুখখানাও বিবর্ণ হয়ে গেল। তার সেই মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, সুবোধবাবুর কথা লেখা রয়েছে না ওতে ?

তাই তো দেখছি।—কমলা ঢোঁক গিলে উত্তর দিলে, কিন্তু এ চিঠি তো কালকের লেখা ! হতচ্ছাড়ারা—

ততক্ষণে পিয়ন চ'লে গিয়েছে, কমলা গায়ের ঝাল মিটিয়ে তিরস্কার করা দূরে থাক্, একটা কৈফিয়ৎ পর্যন্ত তলব করতে পারলে না।

কমলার হাত থেকে চিঠিখানা টেনে নিয়ে সুভদ্রা আর এক বার সেখানা পড়লে ; তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি যাই, কমলা।

কমলা চমকে উঠে বললে, তুমি যাবে ?

কিন্তু সুভদ্রার মুখের উপর চোখ পড়তেই তার মুখের ভাব বদলে গেল। তৎক্ষণাৎ সে আবার বললে, চল, আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।

কিন্তু খোকা ?

সেও আমাদের সঙ্গেই যাবে।—কমলা শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে।

কাগজ টেনে বের ক'রে ওদেরই একখানা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে পরে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনি হুগলীর জেম্‌সন টম্‌সন কোম্পানির কারখানার হাসপাতালে নার্স ছিলেন তো ?

সুভদ্রা মুখে উত্তর দিলে না, অভিভূতের মতই শুধু মাথা নেড়ে জানালে যে, কথাটা সত্য।

তখন অল্প একটু হেসে লোকটি বললে, তা হ'লে আমার ভুল হয় নি, সুভদ্রা দেবী,—আপনাকেই আমরা চাই।

সুভদ্রার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি,—তার মনে হচ্ছিল যে, সে যেন স্বপ্ন দেখছে। বিহ্বল স্বরে সে বললে, কিন্তু কেন ? কি করেছি আমি ?

তা তো জানি নে।—ব'লে লোকটি থেমে গেল ; খুক্ ক'রে এক বার একটু কেসে, চকিতে সুভদ্রার মুখখানি আর এক বার দেখে নিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে আবার বললে, তবে বোধ হয় যে, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আছে ব'লেই এ দুর্ভোগ আপনাকে ভুগতে হবে।

কি বললেন ?—সুভদ্রা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, কার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বললেন ?

লোকটি কথা বললে না, কিন্তু চোখের ইঙ্গিতে সুবোধের মৃতদেহটিকে দেখিয়ে দিলে।

সেই দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সুভদ্রার নিজের চোখ দুটিও আর এক বার সুবোধের মুখের উপর গিয়ে পড়ল।

সেই সৌম্য সুন্দর শান্ত মুখ। বাতায়নের পুরু কাচের ভিতর দিয়ে প্রখর রৌদ্র কোমল হয়ে সেই মুখের উপর এসে পড়েছে। জীবনে ক্ষুব্ধ বাসনার উদ্দাম তরঙ্গের নীচে এত দিন যা আত্মগোপন ক'রে লুকিয়ে ছিল, তারই অনবগুণ্ঠিতা সুষমা আজ মৃত্যুর পরিপূর্ণ শান্তির ভিতর দিয়ে স্নিগ্ধ মাধুর্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সে এক অপার্থিব সৌন্দর্য !

সুভদ্রার বিহ্বল চোখের চকিত দৃষ্টি সেই মুখের উপর গিয়ে পড়তেই অকস্মাৎ তার নিজের কঠিন বিষণ্ণ মুখখানিও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিদ্যুদ্বেগে সেই লোকটির মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, কি বলছেন ? সুবোধবাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে ?

কথা নয়, ওকে তোমায় রাখতেই হবে কমলা। কথা তো অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে, ও তো তোমার।

হঠাৎ কি যেন একটা হয়ে গেল, কমলার মুখের বিষণ্ণ হাসি দেখতে দেখতে স্নিগ্ধ মাধুর্যে মহিমময় হয়ে উঠল।—আমার বই কি! খোকা তো আমারই। বলতে বলতে বুকের উপর খোকাকে সে আরও জোরে চেপে ধরলে; তার পর সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, কিন্তু ওকে মানুষ করবার ভার আমি তোর হাতে ছেড়ে দিলাম, শুভা। মনে যেন থাকে, জেল থেকে ফিরে এসে আমার এই গচ্ছিত ধন আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে।

বিহ্বল মুখে তৎক্ষণাৎ উত্তর ফুটল না; কিন্তু সেই মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটু পরে কমলাই সকৌতুক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার বললে, বোকার মত চেয়ে রইলি যে? এই নে।

বলতে বলতে এক রকম জোর ক'রেই খোকাকে সে সুভদ্রার বুকে তুলে দিলে।

আধ ঘণ্টা পরের কথা।

হাসপাতালের ঠিক সামনেই বড় রাস্তার উপর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল; পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন কন্‌স্টেব্‌ল। ওদেরই এক জন গাড়ির দোর খুলে দিলে। পুলিস-কর্মচারীটি সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আপনি ভিতরে গিয়ে বসুন।

সুভদ্রা কমলার মুখের দিকে তাকাতেও পারলে না, সে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু কমলাই গাঢ় স্বরে বললে, একটু দাঁড়াও, সুভদ্রা।

সুভদ্রা থমকে দাঁড়াল; সে কুণ্ঠিত চোখে ফিরে তাকাতেই কমলার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল; তার পর দুই জোড়া চোখই প্রায় এক সঙ্গেই খোকার মুখের উপর গিয়ে পড়ল।

সুভদ্রার কোলে আসবার সময় খোকার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখন কেঁদেও উঠেছিল সে। কিন্তু মায়ের বুকের পরিচিত কোমল স্পর্শ অনুভব ক'রে তার পর সে আর কাঁদে নি। কেবল তার সরোবরের মত প্রশান্ত নীল

স্বচ্ছ চোখ দুটি দিয়ে সে যেন অপরিসীম বিস্ময়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

কমলা খোকার মুখের উপর ঝুঁকে পড়তেই সেই চোখ দুটি কমলার আনত মুখের উপর গিয়ে প'ড়েই একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল।

কমলা কোন কথা বললে না, কেবল আরও একটু হেঁট হয়ে খোকার কপালের উপর আলগোছে একটি চুমো খেয়েই সে আবার অনেকখানি দূরে স'রে গেল।

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠিল। কন্‌স্টেব্‌ল দুজন আগেই সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে ব'সে ছিল, এবার সাদা-পোশাক-পরা কর্মচারী দুজনও ভিতরে সুভদ্রার দুই দিকে গিয়ে বসল। এক জন ড্রাইভারকে উদ্দেশ ক'রে বললে, চালাও গাড়ি।

কমলা এক দৃষ্টে গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে ঐ ফুটপাথের উপরেই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু গাড়ি আর তার চোখে পড়ল না।

শেষ

দেশ—রাজনীতিই এই কাহিনীর উপজীব্য বা মূল কথা নয়। রাজনীতিগত মতভেদ, ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈপরীত্য, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ইত্যাদির ফলে গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলি ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে যে দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য কাহিনীটি ঘোরালো, উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।···প্রত্যেকটি চরিত্রই সজীব,—সমাজ-জীবনে ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহারা যেন আমাদের পরিচিত। লেখকের ভাষা সরল, সাবলীল; বর্ণনাভঙ্গি প্রশংসনীয়।

যুগান্তর—এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানির এমন একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে যাকে উপেক্ষা করা কঠিন। বইখানির বিষয়বস্তু, তার রচনাভঙ্গি স্বভাবতঃই পাঠকপাঠিকার মন টেনে নিয়ে চলে পরিণতির দিকে,—অসীম কৌতূহলে উৎকণ্ঠিত ক'রে রাখে পাতায় পাতায়।···অননুমোদিত মাতৃত্বের সমস্যা থেকে বিভিন্ন দলগত ঐক্যের সমস্যাকে তিনি বাস্তবের আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলার অসংখ্য গল্প-উপন্যাসের মধ্যে এই বইখানি আপন স্বাতন্ত্র্যে উপভোগ্য।

পূর্ব্বাশা—মণীন্দ্রবাবু সত্যি সত্যি একটি ভাল কাহিনীকে অবলম্বন ক'রেই উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন।···ঘটনাপরম্পরায় "প্রধূমিত বহ্নি" পাঠকের মনে আগাগোড়া একটা কৌতূহল সমান ভাবে জাগিয়ে রাখতে পারে।

প্রবর্তক—লেখকের অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও প্রখর। বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে তিনি নিখুঁত ও নিপুণ ভাবে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের অন্তর্লোককে পরিস্ফুট ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

কৃষক—যে রাজনৈতিক ইতিহাসকে অবলম্বন ক'রে এই কাহিনীর সৃষ্টি, তার চাপে প'ড়ে কাহিনীর শ্বাসরুদ্ধ হয় নি বা তার সহজ গতি ক্ষুণ্ণ হয় নি। অপর পক্ষে ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা না ক'রেও তাঁর রচনা, তাঁর সৃষ্টি ইতিহাসের উর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছে।···গ্রন্থকার যে প্রচুর রস পরিবেশন করেছেন, তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১৯২৯ সালে বাজেয়াপ্ত

কাকোড়ি ষড়যন্ত্র (২য় সংস্করণ)

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম রোমাঞ্চকর কাহিনী

মূল্য—২৲

রুশিয়ার নৈতিক জীবন

(আলোচনা—২য় সংস্করণ)

মূল্য—১৲

স্রোতের টানে (উপন্যাস

মূল্য—২৷৷০

Salaries of Public Servants In India

—A COMPARATIVE STUDY -/8/-

—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—

১৯৩১ সালে বাজেয়াপ্ত

মায়ের ডাক (গল্প-সংগ্রহ)

ভুল (উপন্যাস)

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়